বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট

২০১৮-২০১৯

Dc‡Rjv cwil`

গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট

গ্রন্থস্বত্ব:
উপজেলা পরিষদ, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।

সম্পাদনায়:
তাসনিম জেবিন বিনতে শেখ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।

সহযোগিতায়:
কাজী রাজিব হাসান
জেলা সমন্বয়ক, মুন্সীগঞ্জ।
ইউআইসিডিপি, জাইকা।

মোঃ আবু হাসান
সাঁট-মুদ্রারক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর
উপজেলা পরিষদ কার্যালয়, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।

মোঃ মাহফুজ মিয়াজী
উপজেলা টেকনিশিয়ান (আইসিটি)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।

প্রকাশক:
উপজেলা পরিষদ, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স:
মোঃ আতিক হাসান

মূদ্রণে:
জেরিন-ইফাজ এন্টারপ্রাইজ
৮/৩ বাবুপুরা, নীলক্ষেত, ঢাকা।
মোবাঃ ০১৭১২-৭১৩৯৮৫

পুস্তক আকারে প্রকাশ:
জুন, ২০১৮

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়- প্রাথমিক তথ্য

ভূমিকা
উপজেলা পরিচিতি
এক নজরে গজারিয়া উপজেলা
জনসংখ্যা, অবকাঠামো ও আর্থ-সামজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়-গজারিয়ার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

উপজেলার গুণীব্যক্তিত্ব
উপজেলা দর্শনীয় স্থানসমূহ
মুক্তিযুদ্ধে গজারিয়া
উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল
উপজেলার ভাতাভোগী মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা

তৃতীয় অধ্যায়- কর্ম পরিকল্পনা

উপজেলা পরিষদের ১৭টি স্থায়ী কমিটি
কর্ম পরিকল্পনার প্রত্যাশা
বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য
বার্ষিক পরিকল্পনার রূপরেখা
পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া ও কৌশল
সম্পদ ও এর উৎস
বার্ষিক পরিকল্পনার সীমাবদ্ধতা
কর্মপরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গি
বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ
পরিস্থিতি বিশ্লেষণ
বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা ও ফলাফল
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা (M&E plan)
বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সময় কাঠামো ও পর্যালোচনা চক্র

চতুর্থ অধ্যায়- বিভাগভিত্তিক উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপরিকল্পনা

উপজেলা পরিষদের ১৭টি হস্তান্তরিত বিভাগের স্থায়ী কমিটি
বিভাগভিত্তিক উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি (২০১৮-১৯ অর্থ বছর)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
উপজেলা প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
উপজেলা মৎস্য অধিদপ্তর
উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
উপজেলা প্রাথমিক ও গণ শিক্ষা অধিদপ্তর
উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ
উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায় বিভাগ
উপজেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
উপজেলা বন ও পরিবেশ অধিদপ্তর
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগ
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
উপজেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর

পঞ্চম অধ্যায়- উন্নয়ন পরিকল্পনার আলোকে গৃহীত প্রকল্পসমূহ

প্রকল্প প্রস্তাবনা ফরম্যাট
প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ (Project summary)
প্রশিক্ষণের সার-সংক্ষেপ (২০১৮-১৯)
গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচীর প্রকল্পসমূহের তালিকা (২০১৮-১৯)
গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) কর্মসূচীর প্রকল্পসমূহের তালিকা (২০১৮-১৯)

ষষ্ঠ অধ্যায়- জেন্ডার উন্নয়ন উপজেলা পরিষদ

উপজেলার নারী উন্নয়ন ফোরামের কার্যনির্বাহী সদস্যগণের তালিকা
নারী উন্নয়ন ফোরাম

সপ্তম অধ্যায়- উপজেলা পরিষদের বাজেট

উপজেলা পরিষদের বাজেট সারসংক্ষেপ
রাজস্ব হিসাব (প্রাপ্ত আয়)
রাজস্ব হিসাব (ব্যয়)
উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন হিসাব (প্রাপ্তি)
উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন হিসাব (ব্যয়)

মুখবন্ধ

পরিকল্পনা উন্নয়নের পূর্ব শর্ত। সঠিক পরিকল্পনা ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। পরিকল্পনা বলতে আমরা বুঝি বর্তমান পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যমান সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে অর্জনের জন্য ভবিষ্যতে করণীয় সুশৃঙ্খল কর্মযজ্ঞকে; যেখানে একটি কর্মকান্ড অন্য আরেকটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পরিকল্পনা হতে হবে প্রয়োজন ভিত্তিক, চাহিদা মাফিক ও কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের উপযোগী। পরিকল্পনার অন্যতম বিষয়বস্তু হলো বিদ্যমান সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা। আধুনিক অর্থনীতিতে উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা করা রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ডের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

খাতভিত্তিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন খাতকে বিবেচনাপূর্বক স্থানীয় পর্যায়ে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে গজারিয়া উপজেলায় পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উল্লেখ্য যে, উপজেলা পরিষদ আইন, ২০০৯ অনুযায়ী পরিষদ কর্তৃক তার এখতিয়ারভুক্ত যে কোন বিষয়ে তার তহবিলের সাথে সংগতি রেখে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাসহ যে কোন মেয়াদের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিধান রয়েছে। এছাড়া বর্তমান সরকারের উন্নয়ন "রুপকল্প ২০২১" এবং Sustatinable Development Goals (SDG) অর্জনে তৃণমূল পর্যায় থেকে স্থানীয় চাহিদার নিরিখে খাতভিত্তিক উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়ে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যেখানে জনগণের আশা আকাঙ্খা ও চাহিদার প্রতিফলন ঘটানোর নিমিত্ত প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে তৃণমূল পর্যায়ে জনসাধারণের মতামত গ্রহণ, উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন ও উপজেলা পরিষদে হস্তান্তরিত ১৭ টি স্থানীয় কমিটির সুপারিশ, জনপ্রতিনিধি, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা ও স্থানীয় পর্যায়ের গুনীজনদের মতামত এবং পরামর্শ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পরিকল্পনায় সন্নিবেশ করা হয়েছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, ক্রমহ্রাসমান কৃষি জমি, জলবায়ু পরিবর্তনসহ নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গজারিয়া উপজেলায় বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

ইতোপূর্বে গৃহীত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও বাজেট পুস্তক আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রণীত পরিকল্পনা যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে গজারিয়া উপজেলাকে স্বনির্ভর উন্নত জনপদে রুপান্তর করা সম্ভব হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

মোঃ রেফায়েত উল্লাহ খাঁন

সম্পাদকীয়

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে উপজেলা পরিষদের সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যবস্থার লক্ষ্য হলো জনগণের কাছে বিকেন্দ্রীকরণের সুফল পৌঁছে দেয়া, স্থানীয় উন্নয়ন ও প্রশাসনে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, সরকারি অনুদান ও স্থানীয় সম্পদের ভিত্তিতে স্থানীয় দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে জনগুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন।

গজারিয়া উপজেলা পরিষদ জাতীয় পরিকল্পনার পরিপূরক প্রকল্প গ্রহণ করে এবং তা বাস্তবায়ন করে। উপজেলা পরিষদে রয়েছে স্থানীয় সমস্যার সাথে পরিচিতি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও পেশাগত কর্মকান্ডে পারদর্শী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দ। জনপ্রতিনিধি ও পেশাজীবীদের সম্মিলিত প্রয়াসে স্থানীয় চাহিদা, সম্পদ ও কারিগরি দক্ষতাকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিয়ে সমগ্র উপজেলাটিকে একক হিসেবে বিবেচনা করে প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়।

অপ্রতুল সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত ও স্থানীয় সম্পদ সমাবেশকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদের তহবিল, সরকারের অনুদান ও বিভিন্ন বিভাগের সম্পদসমূহ একটি সঠিক পরিকল্পনার আওতায় আনা হলে লক্ষ্যভিত্তিক জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদান সহজতর হবে এবং উন্নয়ন হবে দৃশ্যমান। উল্লিখিত বিষয়সমূহ উপলব্ধি করে ও উপজেলা পরিষদ আইনের নির্দেশনা অনুসরণপূর্বক গজারিয়া উপজেলা পরিষদ ইতোমধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন করে; যা পুস্তক আকারে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

গজারিয়া উপজেলা পরিষদের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নসহ পুস্তক আকারে প্রকাশের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। উপজেলা পরিষদের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণে প্রণীত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও জনকল্যাণমূখী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই হোক আমাদের সকলের অঙ্গীকার।

তাসনিম জেবিন বিনতে শেখ

বাণী

গজারিয়া উপজেলার পরিষদ তার সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের উপর ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট পুস্তক আকারে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। সুষ্ঠু পরিকল্পনা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। তাই গজারিয়া উপজেলা পরিষদের এ ধরণের উদ্যোগ প্রশংসার দাবীদার। দেশের আপামর জনগণের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে হলে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা অত্যন্ত জরুরী।

উপজেলা পদ্ধতি গ্রাম বাংলার তৃণমূল পর্যায়ের গণমানুষের প্রাণের দাবী। উপজেলা পরিষদ কার্যক্রম বারবার বন্ধ হওয়া সত্ত্বেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশীল ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯১ খ্রি. বন্ধ করে দেওয়া উপজেলা প্রথা পুনরায় চালুর উদ্দেশ্যে ১৯৯৮ সালে উপজেলা পরিষদ আইন পাশ করেন। জনকল্যাণ ও সু-শাসন প্রতিষ্ঠাই এর মূল উদ্দেশ্য।

উপজেলা পরিষদের নিজস্ব সম্পদ এবং জনবলকে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার আওতায় ব্যবহার করলে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব। তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের মতামতের ভিত্তিতে চাহিদাভিত্তিক (Need Based) প্রকল্প গ্রহণ করে গজারিয়া উপজেলা পরিষদ বাংলাদেশের একটি আদর্শ উপজেলায় পরিণত হবে।

গজারিয়া উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে দেশের অন্যান্য উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনা প্রণয়নে এগিয়ে আসবে এবং সীমিত সম্পদ ও জনবলের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

এ্যাড. মৃনাল কান্তি দাস

বাণী

গজারিয়া উপজেলা পরিষদ গৃহীত ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট পুস্তক আকারে প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এই উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট বই উপজেলার হস্তান্তরিত-সংরক্ষিত বিভাগের পাশাপাশি পরিষদের সার্বিক কার্যক্রম আরো সুশৃঙ্খল এবং কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি। এছাড়া বাজেট প্রণয়ন উপজেলা পরিষদের আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

উপজেলা পরিষদকে একটি গণতান্ত্রিক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হলে পরিষদের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর, ইউনিয়ন পরিষদ এবং সাধারণ জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। পরিষদকে একটি জনমূখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা এবং এর সেবা সাধারণ মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়ার জন্য পরিষদকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। ইতোমধ্যে গজারিয়া উপজেলা পরিষদকে আরো কার্যকর, গণতান্ত্রিক, সেবামূখী ও জবাবদিহিতামূলক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়ন আশাব্যঞ্জক প্রয়াস বলে আমার নিকট প্রতীয়মান হয়েছে; যা "ভিশন ২০২১" ও ``Sustainable Development Goals (SDG)`` অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

এই উদ্যোগের জন্য উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভাইস চেয়ারম্যানদ্বয়সহ পরিষদের সকল সদস্য এবং বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাগণসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। গজারিয়া উপজেলা পরিষদের এই উদ্যোগ অন্যান্য উপজেলার জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

আমি গজারিয়া উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিককল্পনা ও বাজেট বই প্রণয়নে গৃহীত উদ্যোগের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

সায়লা ফারজনা

বাণী

সোনার বাংলা গড়ে তুলতে হলে তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপক উন্নয়ন আবশ্যক। আর তা বাস্তবায়ন করতে হলে প্রয়োজন একটি সুস্থ, সুনির্দিষ্ট এবং বাস্তবভিত্তিক পরিকল্পনা। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে গজারিয়া উপজেলা পরিষদ কর্তৃক উপজেলা পরিষদ তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই আকারে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করি এ পরিকল্পনা সময়ের চাহিদাপূরণ করে এলাকার উন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে।

উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আইন-শৃঙ্খলার উন্নয়ন সাধন, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়ন, যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন, সমাজসেবা, সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যদি দেশের সার্বিক উন্নয়নের ধারা অক্ষুন্ন রাখতে হয় তাহলে উপজেলা পরিষদের উন্নয়নের ধারাকে বেগবান রাখা বাঞ্চনীয়। এই পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে প্রতিটি খাতের উন্নয়ন এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে এবং উন্নত বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

উপজেলা পরিষদের জনপ্রতিনিধি ও সকল স্তরের সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দকে সাথে নিয়ে এই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট বাস্তবায়ন করা গেলে গজারিয়া উপজেলা একটি আদর্শ উপজেলায় পরিনত হবে। গণতন্ত্রকে সুসংহত করে উপজেলা পরিষদকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করা গেলে সুশাসন নিশ্চিত হবে বলে আমি মনে করি।

সবশেষে এ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পুস্তক আকারে প্রকাশের সাথে সংশিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

মোঃ আসাদুজ্জামান

বাণী

গজারিয়া উপজেলা পরিষদের উদ্যোগে ইতোপূর্বে গৃহীত উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট বই আকারে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। টেকসই উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনায় তৃণমূল পর্যায়ে জনসাধারণের অংশগ্রহণ অনস্বীকার্য। বইটি প্রকাশের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনায় একদিকে যেমন স্থানীয় জনগণের আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটবে তেমনি উন্নয়নে সুশাসন প্রতিষ্ঠা পাবে। অত্র এলাকায় একজন নারী জনপ্রতিনিধি হিসেবে এলাকার পক্ষ থেকে দেশবাসীকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পরিশেষে এই উন্নয়ন পরিকল্পনা বই প্রকাশে যারা সার্বিক সহযোগিতা ও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

অধ্যাপিকা ফরিদা ইয়াছমিন

প্রথম অধ্যায়

প্রাথমিক তথ্য

ভূমিকা:

উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার একটি অন্যতম স্তর। জনসংখ্যা, আয়তন, অনগ্রসরতা, অবকাঠামোগত সুযোগ, প্রশাসনিক সুবিধা ইত্যাদির নিরিখে উপজেলা সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৮৪ সালে উপজেলা গঠিত হওয়ার পর গ্রামীণ জনপদের উন্নয়নে স্থানীয় সরকারের এ প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯১ খ্রি: বন্ধ করে দেয়ার পর ২০০৯ সালে উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের পর অনেকটা নতুনভাবে প্রতিষ্ঠানটি কার্যক্রম শুরু করে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমুহের সমন্বয়হীনতা, কেন্দ্রীয় সরকারের অপ্রতুল বরাদ্দ, উপজেলা পরিষদ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও সক্ষমতার অভাব, পাশাপাশি উপজেলা পরিষদ আইনের দূর্বলতা আর কেন্দ্রিয় সরকারের সুদৃষ্টির অভাবে উপজেলা পরিষদ এখনও কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। গজারিয়া উপজেলা পরিষদও এ বৃত্ত থেকে বের হয়ে আসতে পারেনি। তবে আশার কথা উপজেলা গর্ভণ্যান্স প্রজেক্ট এর সহায়তায় গজারিয়া উপজেলা পরিষদ কাঠামোগতভাবে শক্তিশালীকরণ এবং এর দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক ও কার্যকর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার সেবা সাধারণ জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে দিতে সচেষ্ট হয়েছে। এরই প্রয়াস হিসেবে উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নপূর্বক বই প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন পরিষদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা তথা সুশাসন প্রতিষ্ঠা পরিষদকে কার্যকর ও গতিশীল করার ক্ষেত্রে অন্যতম ধাপ।

ছক চিত্র-১: উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বাজেট প্রণয়নের সাংগঠনিক প্রক্রিয়া

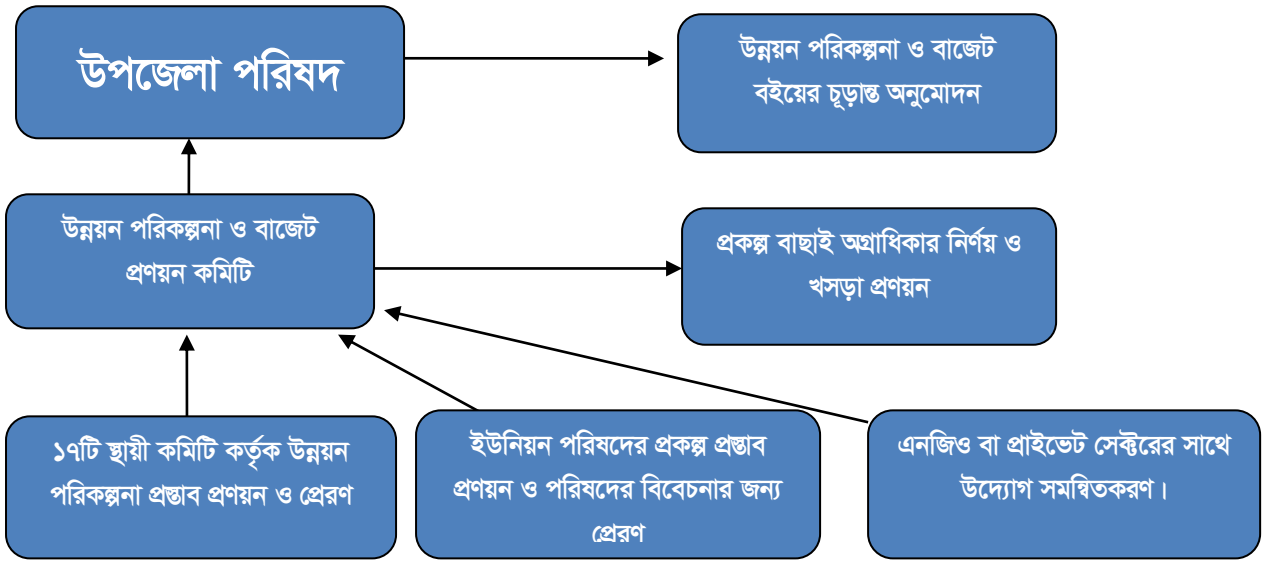

উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ এর ৪২ ধারা অনুযায়ী পরিষদ তার এখতিয়ারভুক্ত বিষয়ে তহবিলের সাথে সংগতি রেখে বার্ষিক পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং তা বাস্তবায়নের বিধান রয়েছে। স্থানীয় সমস্যা ও সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং খাতভিত্তিক পরিকল্পনাকে সামঞ্জস্য করে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন রূপকল্প (ভিশন)- ২০২১ এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা সক্রিয় বিবেচনা করে গজারিয়া উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনা ও বাজেট প্রনয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

উপজেলা পরিচিতি

গজারিয়া উপজেলার উত্তরে নারায়নগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলা ও কুমিল্লা জেলার মেঘনা উপজেলা, দক্ষিণে চাঁদপুর জেলার মতলব উপজেলা, পূর্বে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলা, পশ্চিমে মুন্সীগঞ্জ সদর ও সোনারগাঁও উপজেলা। গজারিয়ার চারদিকে রয়েছে জালের মত বেষ্টন করে মেঘনা নদী। শীতলক্ষা ও বুড়িগঙ্গার মিলিত ধারা মেঘনা নদীর সাথে গজারিয়ার পশ্চিম পাশে মিশেছে। পরে সোজা দক্ষিন দিকে পদ্মার সাথে মিলিত হয়ে পুনরায় মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। উত্তর ও পূর্ব পাশে মেঘনা ও গোমতির জলধারা মিলিত হয়ে ষাটনলের নিকট মেঘনা নদীতে পতিত হয়েছে। বাংলাদেশ-জাপান সেতু-১ম সেতু (মেঘনা সেতু) উত্তরে নারায়নগঞ্জ জেলার সাথে এবং বাংলাদেশ-জাপান ২য় সেতু (মেঘনা-গোমতি সেতু) কুমিল্লা জেলাসহ দুই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে সৃষ্টি করেছে ভ্রাতৃত্বের মহা মিলন।

নামকরণ

বাংলাদেশের বেশির ভাগ অঞ্চলের নামের ইতিহাস লুপ্ত। নানা কারনে নামের পরিবর্তনও হয়েছে। গজারিয়া উপজেলার নামকরনের ইতিহাসও অস্পষ্ট। জনশ্রুতি রয়েছে এখানে এককালে প্রচুর গজারি গাছ ছিল। 'রিয়া' নামের এক ধরনের পাখি থাকত সেই গজারি বনে। তাই এই এলাকার নামকরণ হয় গজারিয়া। গজারি সাধারণত উচুঁ ও শুল্ক অঞ্চলের গাছ। আর এই এলাকাটি বছরে অন্তত পাচঁ মাস জলমগ্ন থাকত। চর কিংবা নিচু এলাকায় গজারি গাছের টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব। তবে অনেকে মনে করেন নদী দিয়ে ভেসে আসত গজারি কাঠ। তাই নাম গজারিয়া।

বলা হয়ে থাকে, ঈশা খাঁর পিতা রাজপুত বীর কালীদাস গজদানীর নামেও এই এলাকার নামকরণ হতে পারে। যদিও ইতিহাস বলে, গজারিয়ার উদ্ভব ঈশা খাঁর পতন-পরবর্তীতো। ফলে এটিও যুক্তিসংগত বলে মনে করা হয় না। ঈশা খাঁর রাজহাতি সাতরে নদী পার হতো বলে জনশ্রুতি রয়েছে। হাতির আরেক নাম গজ। সেই গজ থেকে গজারিয়া নামের উৎপত্তি হতে পারে বলে ধারনা করা হয়।

গজারিয়া নামকরণ সম্পর্কে আরেকটি মতবাদও প্রচলিত। ঔপনিবেশিক যুগে এটি ছিল চরাঞ্চল। ইংরেজ সিভিলিয়ানরা এখানে আসতেন শিকারের জন্য। একদিন এক সিভিলিয়ান ও তার অনুচরেরা শিকারের জন্য নদীর পাড় ধরে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন। এ সময় তাদের নজরে পড়ে ভেসে থাকা একটি হাতির শবদেহের উপর ঠাঁয় বসে আছে একটি রিয়া পাখি। সিভিলিয়ান পাখিটি শিকার করতে পেরে আনন্দিত চিত্তে এই এলাকার নাম রাখেন গজারিয়া। এই মতটিকেই বেশিরভাগ মানুষ গ্রহনযোগ্য বলে মনে করেন। কারণ রিয়া হচ্ছে দ্বীপবাসী পাখি। উটপাখির মতো বলে এরা উড়তে পারে না। সাতার কিংবা দৌড় দিয়ে আত্মরক্ষা করে।

প্রায় কাছাকাছি একটি মতও আছে। নদীবিধৌত হওয়ায় শীতকালে সাইবেরিয়া থেকে প্রচুর পরিমানে পাখি খাদ্যের অন্বেষণে এই এলাকায় আসত। এই সব পরিযায়ী পাখির আনাগোনায় মুখর থাকত চরাচর। মূলত পাখি শিকারের নেশায় অনেক বিদেশি পর্যটক এই এলাকায় আসতেন। নৌপথে তারা পাখি শিকার করে বেড়াতেন। একসময় পাখি শিকারের জন্য এই স্থানটি বিখ্যাত হয়ে যায় এবং এলাকাটির নাম হয়ে যায় গজারিয়া।

মোগল আমলে যুদ্ধে ব্যবহৃত ছোট কামানকে বলা হত 'গজনাল'। সে সময় গজারোহী,অশ্বারোহী,পদাতিক ও নৌবাহিনীর অস্তিত্ব ছিল। যুদ্ধে ব্যবহৃত নৌকার মধ্যে উল্লেকযোগ্য ছিল কাটারি, মানিকী, বাতিলা, জালিয়া, ধুরা, সুন্দর, কোশা, বজরা ইত্যাদি। কোনো কোনো নৌকা এত বৃহৎ ছিল যে সেগুলোতে অশ্ব এমনকি হস্তীও বহন করা হতো। সেই গজনাল থেকে গজারিয়া হয়েছে এমন ধারণা কারও কারও। আবার অনেকে মনে করেন গজারিয়া নামকরণ হয়েছে গজার মাছ থেকে। এক কালে নদীতে প্রচুর গজার মাছ ছিল। সেই মাছ লাফাতে লাফাতে প্রায় ডাঙায় উঠে যেত। তাই নাম হয়ে যায় গজারিয়া।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

একসময় মানুষ পায়ে হেঁটে চলাচল করত। বর্ষাকালে যখন পথঘাট ডুবে যেত তখন অত্র এলাকার লোকজন নৌকায় এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাতায়াত করত। বিয়েতে ব্যবহৃত হতো পালকি। ঘোড়ার ব্যবহারও ছিল কিন্তু তা ছিল খুবই সীমিত কিংবা অভিজাত শ্রেণির মানুষের জন্য। ভেগোলিক কারণে কোনোকালেই এখানে গরুর গাড়ির প্রচলন ছিল না। নৌপথই ছিল যোগাযোগের প্রধানতম পথ। ফলে দূরের যাত্রার প্রধানতম বাহন ছিল নৌকা।

নৌযোগাযোগ

অতীতে নদী বিধৌত গজারিয়া উপজেলার সাথে পাশ্ববর্তী অঞ্চলের যোগাযোগের একমাত্র বাহন ছিল নৌকা। তখন মানুষ প্রতিদিন কোষা, কেরাই, ডিঙি, ছইয়া, গয়না আর পানসি নাওয়ে নারায়ণগঞ্জে যাতায়াত করত। গজারিয়ার অনেক আগে থেকেই লঞ্চ সার্ভিস চালু ছিল। দাউদকান্দি বাজার থেকে লঞ্চ ছেড়ে ভিটিকান্দি, মেঘনাঘাট, মুন্সিগঞ্জ হয়ে নারায়ণগঞ্জে গিয়ে যাত্রা শেষ করত। এই রুটে চলাচল করত আবুল বাশার-৪, সৈয়দা এক্সপ্রেস, আসমানিয়া, হেজাজ ও ফিরোজা নামের লঞ্চ। ফেরার সময় লঞ্চগুলো দাউদকান্দির জাপুর, গৌরিপুর পযর্ন্ত যেত। ১৮৬২ সালে নারায়ণগঞ্জ-গোয়ালন্দ নৌরুটে নিয়মিতভাবে স্টিমার সার্ভিস চালু হয়। নারায়ণগঞ্জ থেকে চাঁদপুর আর গোয়ালন্দের যাত্রাপথে গজারিয়া লঞ্চ টার্মিনালে ভিড়ত গাজী আর অস্ট্রিজ নামের বিশাল স্টিমার।

গজারিয়া গ্রামের শেষ প্রান্তেই ছিল এই টার্মিনাল। এখনো আছে সেই টার্মিনাল। রাতের বেলায় স্টিমারের আওয়াজ ভবেরচর ও বাউশিয়া থেকেও শোনা যেত। ষাটের দশকে গজারিয়া থেকে নারায়ণগঞ্জের স্টিমার ভাড়া ছিল চার আনা।

ব্রিটিশ শাসনামলে থেকে পাকিস্তান আমলের পুরো সময় আইজিএন ও আরএসএন কোম্পানির বাষ্পচালিত পণ্যবাহী স্টিমার ভৈরব থেকে নারায়ণগঞ্জে যাতায়াত করত। সেই স্টিমার ভিড়ত হোসেন্দী ঘাটে। সত্তর দশক পর্যন্ত হোসেন্দী স্টিমার ঘাটটির অস্তিত্ব ছিল।

বর্তমানে মেঘনা ও গোমতী নদীর উপর সেতু নির্মীত হওয়ায় মেঘনাঘাট হতে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত লঞ্চ সার্ভিস বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তবে নারায়ণগঞ্জ হতে চাঁদপুরগামী লঞ্চ সার্ভিসগুলো গজারিয়া হয়ে চাঁদপুরে তাদের যাত্রা শেষ করে।

মহাসড়ক ও সড়ক যোগাযোগ

যেকোনো এলাকার উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। ১৯৬০ সালের আগ পর্যন্ত গজারিয়ায় কোনো পাকা রাস্তা ছিল না। রাস্তা বলতে ছিল গোপাট অর্থাৎ মানুষের হাটা-চলায় যে পথ তৈরি হতো। এই সব রাস্তায় ছিল বাশের সাঁকো। কদাচিৎ কাঠের পুলও চোখে পড়ত।

১৯৫৬ সালে প্রাদেশিক সংসদে তৎকালীন এমএলএ মনির হোসেন জাহাঙ্গীর ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক গজারিয়ার ওপর দিয়ে তৈরির প্রস্তাব করেন। ১৯৬০-৬১ সালে গজারিয়ার ওপর দিয়ে নির্মিত হয় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক। এই মহাসড়কের ১৭ কিলোমিটার রাস্তা গজারিয়ার ওপর দিয়ে বয়ে যায়। মুসলমান শাসনামলে শেরশাহ সোনারগাঁও থেকে নীলাভ পর্যন্ত একটি সুপ্রশস্ত রাস্তা তৈরি করেছিলেন। রাস্তাটি গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড হিসেবে পরিচিত। অপর দিকে ব্রিটিশ আমলেই দাউদকান্দি থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত কাচাঁ রাস্তা ছিল। এই দুই অঞ্চলের সংযোগ ঘটায় গজারিয়ার ভেতরকার এই সড়ক। বর্তমানে দেশের ২২টি জেলার মানুষ প্রতিদিন এই সড়ক দিয়ে চলাচল করে থাকে।

নব্বই দশক পর্যন্ত ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক ছিল বৃক্ষশোভিত। দুই পাশে ছিল সারি সারি কড়ুই ও শিশুগাছ। নব্বই দশকের আগে এই সড়কের মেঘনা ও গোমতী এই দুই নদীতে বড় বড় ফেরি চলত। ভবেরচরে একটি শিমুলগাছের তলায় অল্পসল্প বাস থামত। ১৯৮৭ সালের ২৮ আগষ্ট এখানে বাসস্ট্যান্ড নির্মানের দাবি ওঠে। ওই বছরই ভবেরচরে বাসস্ট্যান্ড নির্মিত হয়। এর আগে বাসস্ট্যান্ড ছিল পুরান বাউশিয়া নিমাইবাড়ির সামনে। মহাসড়ক নির্মাণের পরপরই গোপাট ধরে ভবেরচর থেকে রসুলপুর পর্যন্ত রাস্তাটি নির্মিত হয়। বর্তমানে গজারিয়ায় আঞ্চলিক রাস্তার পরিমাণ ১২০ কিলোমিটার।

ফেরী যোগাযোগ

গজারিয়া উপজেলায় মোট ৩টি ফেরী সার্ভিস চালু রয়েছে। এর মধ্যে ১টি আন্ত:জেলা (গজারিয়া-মতলব উত্তর), ১টি আন্ত:উপজেলা (গজারিয়া-মুন্সীগঞ্জ সদর) এবং ১টি আন্ত: ইউনিয়ন (গজারিয়া ইউনিয়ন-ইমামপুর ইউনিয়ন)। উল্লেখ্য যে, ৩ জুন, ২০১৮ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গজায়িাবাসীকে স্বর্ণচাপা নামের একটি ফেরী উপহার দেন এবং এর শুভ উদ্বোধণ ঘোষণা করেন। এ ফেরী সার্ভিস চালু হবার কারণে গজারিয়াবাসীর ৬০/৭০ কিলোমিটার রাস্তা কমে গিয়েছে। এখন উপজেলা পরিষদ থেকে গজারিয়াবাসী প্রায় ৮ (আট) কিলোমিটার রাস্তা পার হয়ে মুন্সীগঞ্জ সদরে পৌঁছতে পারবে। এছাড়াও মুন্সীগঞ্জ সদর-গজারিয়ায় ফেরী সার্ভিস চালু হবার ফলে দক্ষিণ বঙ্গের সাথে পূর্ব বঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হয়েচে।

মানচিত্রে গজারিয়া

রোড ম্যাপে গজারিয়া

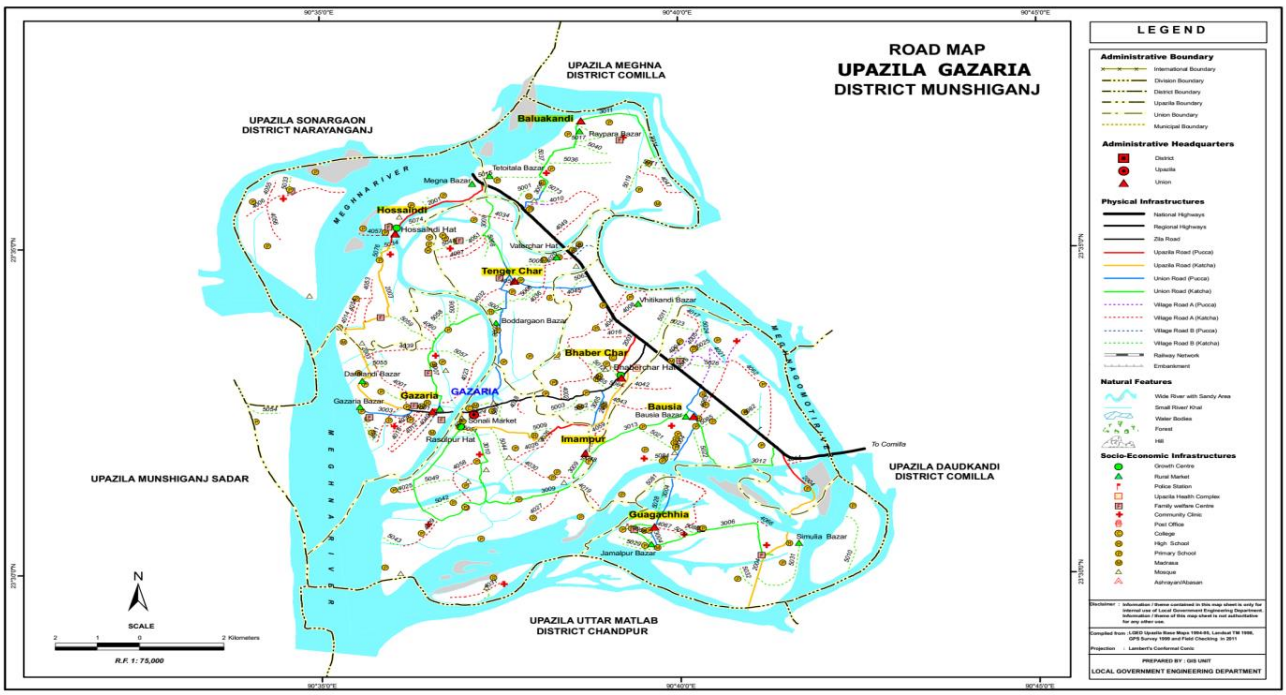

এক নজরে গজারিয়া উপজেলা

ক্র. নং	বিবরণ	সংখ্যা	ক্র. নং	বিবরণ	সংখ্যা
০১	উপজেলার আয়তন	১৩১ বর্গ কি.মি.	৪০	আদর্শ গ্রাম/গুচ্ছ গ্রাম	০২টি
০২	ইউনিয়নের সংখ্যা	০৮ টি	৪১	পুকুর	২৬০ টি
০৩	গ্রামের সংখ্যা	১৩৩টি	৪২	মোট জেলের সংখ্য	২,০৭২ জন
০৪	মৌজার সংখ্যা	১১০টি	৪৩	খালের সংখ্যা	০৮টি
০৫	জনসংখ্যা	১,৫৭,৯৮৮ জন (৭৮,৭৪৪ জন নারী ও ৭৯,২৪৪ জন পুরুষ)	৪৪	নদী	০৩টি
০৬	জনসংখ্যার ঘণত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি.)	১২০৬ জন	৪৫	জল মহল	০২টি
০৭	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১.৩৩%	৪৬	খেয়া ঘাট/নৌকা ঘাট	০৭টি
০৮	থানা	১টি	৪৭	টিউবওয়েল (সরকারী)	২,০৬১টি
০৯	হাইওয়ে পুলিশ ফাড়ি	১টি	৪৮	হাট বাজার	০৭ টি
১০	নৌ পুলিশ ফাড়ি	১টি	৪৯	ডাকঘর	১৩টি
১১	গজারিয়া থানা তদন্ত কেন্দ্র,	১টি	৫০	ব্যাংক	১৩টি
১২	ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফেন্স	১টি	৫১	টেলিফোন (সংযোগসহ)	৩০টি
১৩	কোস্টগার্ড ষ্টেশন	১টি	৫২	বিদ্যুতায়িত গ্রাম	৯২ টি
১৪	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮৭ টি	৫৩	বৈদ্যুতিক উপ-কেন্দ্র	০২ টি
১৫	প্রা.বি.-তে উপবৃত্তি সুবিধাভোগী মোট পরিবার সংখ্যা	৬,৭৭৭ টি	৫৪	মসজিদ	৩৪৯টি
১৬	নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	০২টি	৫৫	মন্দির	১৬ টি
১৭	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৮টি	৫৬	সরকারী/বেসরকারী রেস্ট হাউজ	০২ টি
১৮	কলেজ	৩টি	৫৭	এন.জি.ও	০৮ টি
১৯	মাদ্রাসা	০৫টি	৫৮	অর্থনৈতিক অঞ্চল	০১টি
২০	ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজ	১ টি	৫৯	বন্যা/সাইক্লোন সেন্টার	১৬ টি
২১	ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট	০১টি	৬০	স' মিল	১৫ টি
২২	শিক্ষার হার	৫৭.৩৪%	৬১	ইট ভাটা	০৩ টি
২৩	সরকারী হাসপাতাল	০১টি (৫০ শয্যা)	৬২	পেট্রোল পাম্প/ফিলিং স্টেশন	১১ টি
২৪	ইউনিয়ন উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র	০৪টি	৬৩	সার কারখানা	০১ টি
২২	ইউনিয়ন পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	০৪টি	৬৪	পেপার মিল	০৫ টি
২৩	কমিউনিটি ক্লিনিক	১৭টি	৬৫	টেক্সটাইল মিল	০১টি
২৪	বেসরকারী হাসপাতাল/ক্লিনিক	০৩টি	৬৬	পাকা রাস্তা	৬৯ কি.মি
২৫	ডায়াগনস্টিক সেন্টার	০৭টি	৬৭	কাঁচা রাস্তা	১৫৪ কি.মি.
২৬	বয়স্ক ভাতা গ্রহীতার সংখ্যা	৩৬০৯ জন	৬৮	কৃষি জমির পরিমাণ	১০,৭৮৯ একর
২৭	বিধবা ভাতা গ্রহীতা	১,১৭৬ জন	৬৯	গার্মেন্টস	০২ টি
২৮	প্রতিবন্ধী ভাতা গ্রহীতা	৩৬৭ জন	৭০	সিমেন্ট কারখানা	০২ টি
২৯	মুক্তিযোদ্ধা ভাতা গ্রহীতা	৩৪১ জন	৭১	জাহাজ শিল্প	
৩০	ভিজিডি গ্রহীতা	১,২৯৯ জন	৭২	অন্যান্য মিল	১৪ টি
৩১	মোট জমির পরিমাণ	১৩,০৯২ হেক্টর,	৭৩	জুট মিল	১ টি
৩২	নীট আবাদী জমি	৬,৯৯০ হেক্টর	৭৪	সুতার কারখানা	১ টি
৩৩	মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যা,	২৩,০৮৪ জন,	৭৫	জাহাজ শিল্প	৩ টি
৩৪	ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা	৪,০৩২ জন,	৭৬	খাদ্য গুদাম	১টি
৩৫	মোট খাদ্য চাহিদা	২৫,২৭৫ মে.টন,	৭৭	হিমাগার	২টি
৩৬	মোট খাদ্য উৎপাদন	১৬,০৯১ মে.টন,	৭৮	স্টীল ইন্ডাস্ট্রিজ	১ টি
৩৭	প্রধান ফসল	আলু, বোরো ধান	৭৯	কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ	১ টি
৩৮	মাতৃত্বকালীন ভাতা গ্রহীতা	২২৪ জন	৮০	প্রাণি হাসপাতাল	১টি
৩৯	আশ্রয়ন/আবাসন প্রকল্প	০৬টি			

জনসংখ্যা, অবকাঠামো ও আর্থ-সামজিক মৌলিক তথ্য ও উপাত্ত

বিষয়	পরিমাণ/সংখ্যা	উৎস/বছর
উপজেলার রুপরেখা		
আয়তন	ক) ১৩১ বর্গ কি.মি. খ) ৫১ বর্গ মাইলবর্গ কি.মি	জেলা আদম শুমারি ২০১১
জনসংখ্যা	১,৫৭,৯৮৮ জন (নারী-৭৮,৭৪৪ জন; পুরুষ-৭৯,২৪৪ জন)	
খানা/ পরিবার		
জনসংখ্যার ঘনত্ব	১২০৬ জনপ্রতি বর্গ কি.মি	
পৌরসভার সংখ্যা		২০১৮ সাল পর্যন্ত
ইউনিয়নের সংখ্যা	০৮ টি	২০১৮ সাল পর্যন্ত
গ্রামের সংখ্যা	১৩৩টি	২০১৮ সাল পর্যন্ত
গুরুত্বপূর্ণ সরকারি/ গণ অবকাঠামো		
হাট-বাজার	০৭ টি	২০১৮ সাল পর্যন্ত
প্রজনন কেন্দ্র		২০১৮ সাল পর্যন্ত
হাসপাতাল	০১টি	২০১৮ সাল পর্যন্ত
উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র	০৪টি	২০১৮ সাল পর্যন্ত
ব্যাংকের শাখা	১৩ টি	২০১৮ সাল পর্যন্ত
ডাকঘর	১৩টি	২০১৮ সাল পর্যন্ত
প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬৩ টি	২০১৮ সাল পর্যন্ত
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	১৭টি	২০১৮ সাল পর্যন্ত
বিশ্ববিদ্যালয়/ কলেজ	০৩টি	২০১৮ সাল পর্যন্ত
মসজিদ	৩৪৯টি	২০১৮ সাল পর্যন্ত
মন্দির	১৬ টি	২০১৮ সাল পর্যন্ত
নৌকার ঘাট	০৭টি	২০১৮ সাল পর্যন্ত
গুরুত্বপূর্ণ আর্থ-সামাজিক তথ্য		
মাথাপিছু দারিদ্রের হার (%) (এসডিজি- ১)	৩২	২০১৮ সাল পর্যন্ত
কম ওজনের শিশুর হার (%) (এসডিজি- ২)	৩০	২০১৮ সাল পর্যন্ত
৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার (এসডিজি- ৩)		২০১৮ সাল পর্যন্ত
শিক্ষার হার: প্রাথমিক সমাপ্ত (১৮ বছর বা অধিক বয়সী) (%) (এসডিজি ৪)	২৮৬/৫৪৪	২০১৮ সাল পর্যন্ত
উপজেলা, ইউনিয়ন ও পৌরসভায় নারী সদস্য সংখ্যা (%) (এসডিজি ৫)	১/৩	২০১৮ সাল পর্যন্ত
কলের পানি সরবরাহের আওতাধীন পরিবার (%) (এসডিজি ৬)	৪	২০১৮ সাল পর্যন্ত
নলকুপের পানি সরবরাহের আওতাধীন পরিবার (%) (এসডিজি ৬)	৩৪৬/৫৪৪	২০১৮ সাল পর্যন্ত
বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতাধীন পরিবার (%) (এসডিজি ৭)	২৬৯৪০	২০১৮ সাল পর্যন্ত

দ্বিতীয় অধ্যায়

উপজেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

গজারিয়ার ঐতিহ্য

উপজেলার গুণীব্যক্তিত্ব

সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর

সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর ছিলেন লেখক, প্রাচীন নিদর্শনাদির সংগ্রহক, ঐতিহাসিক, নারীশিক্ষা আন্দোলনের অগ্রপথিক। ১৯৫২ "গ্লিমসেস অব ওল্ড ঢাকা" নামে তার একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এটি ঐতিহাসিক ঢাকার বিবর্তনের গবেষণমূলক একটি গ্রন্থ। তিনি সোনারগাঁওয়ের বিখ্যাত দরবেশ সৈয়দ ইবরাহিম দানিশমন্দের বংশধর। তিনি, তার বাবা সৈয়দ আবদুল আজীজ ও পিতামহ সৈয়দ গোলাম মোস্তফা আল হুসেনী গজারিয়া এলাকার আশ্রবদীর জমিদার ছিলেন।

জন্ম ও পড়াশোনা

সৈয়দ তৈফুর ১৮৮৫ সালের ০৩ জুন ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা ও কলকাতায় মাদ্রাসা শিক্ষা লাভ করেন। বাংলা, ইংরেজী, উর্দু ও ফারসি ভাষায় তিনি সমান পারদর্শী ছিলেন। ঢাকার অভিজাত সমাজে সৈয়দ তৈফুর একজন বিদ্বান ব্যক্তি হিসেবে সমাদৃত ছিরেন। তিনিই প্রথম ইংরেজীতে Dacca এর পরিবর্তে Dhaka শব্দটি ব্যবহার করেন। তার মৃত্যুর দশ বছর পর ১৯৮২ সলে এই বানানই ঢাকার ইংরেজী বানান হিসেবে গৃহীত হয়।

চাকরি জীবন

তিনি ১৯০৯ সালে কলকাতায় সহকারী রেজিস্ট্রার হিসেবে সরকারী চাকরিতে যোগ দেন। এরপর চাকরির সুবাদে নানা জায়গায় চাকরি করেন। ১৯৪২ সালে অবসর গ্রহণ করেন কলকাতার রেজিস্ট্রার হিসেবে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সরকার তাকে "খান সাহেব" উপাধি প্রদান করে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সময় তিনি এই খেতাব প্রত্যাখ্যান করেন।

গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব

সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ইডেন কলেজের পরিচালক সদস্য, ঢাকার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সদস্য, জগন্নাথ কলেজের পরিচালক এবং ঢাকা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্টের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তিনি ঢাকা জাদুঘরের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ছিলেন। তিনি তার ব্যক্তিগত বহু সংগ্রহ জাদুঘরে দান করেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। বেশ কিছু দুর্লভ গ্রন্থ এবং আরবি ও ফারসি ভাষায় রচিত পান্ডুলিপি এশিয়াটিক সোসাইটিকে দান করেন।

নারী শিক্ষার অগ্রপথিক

সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুরকে নারীশিক্ষা ও নারীর অধিকার আদায়ে অন্যতম পথিকৃৎ বলা যায়। তিনি সর্বতোভাবে তার তিন কন্যা লুলু বিলকিস বানু, রায়লা আজুমান্দ বানু ও মালকা পারভীন বানুকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে উৎসাহিত করেন। এই ঘটনা ছিল তৎকালীন যুগে নারীদের কঠোর সামাজিক বিচ্ছন্নতার মধ্যেও এক ব্যতিক্রম প্রয়াস। তৈফুরের স্ত্রী সারা তৈফুর নারীমুক্তির আদর্শে সমান বিশ্বাসী ছিলেন। তার সমাজকর্ম ও লেখালেখির কারণে তাঁকে ইংরেজ সরকার "কাইজার-ই-হিন্দ" পদকে ভূষিত করে।

উত্তরাধিকার

তার বড় মেয়ে লুলু বিলকিস বানু ভিকারুন নিসা নূন স্কুলের প্রতিষ্ঠাকালীন প্রধান শিক্ষক ছিলেন। লায়লা আজুমান্দ বানু বাংলাদেশের একজন অন্যতম পুরোধা সংগীতশিল্পী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ছোট মেয়ে মালেকা পারভীন বানুও শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

মৃত্যুবরণ

অবসরজীবনে তিনি ঢাকার ঐতিহ্যবাহী কায়সার হাউসে বসবাস করলেও গ্রামের মানুষের সঙ্গে তার আমৃত্যু যোগাযোগ ছিল। ১৯৭২ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী তিনি ৮৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকার সিদ্দিক বাজার পারিবারিক কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়।

গরীব হোসেন চৌধুরী

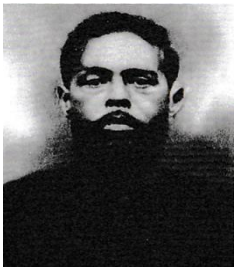

শৈশবে বাবার মৃত্যুর কারণে কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেছেন গরীব হোসেন চৌধুরী। পরের বাড়ীতে জায়গির থেকে লেখপড়া করতেন। ছাত্র হিসেবেও তুখোড় ছিলেনা। আর্থিক দৈন্যতার কারণে বেশী দূর পড়তে পারেননি। ব্রিটিশ আমলে গজারিয়ায় কোন হাই স্কুল ছিল না। ফলে এই এলাকার মানুষ মাধ্যমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল। সেই প্রণোদনা থেকে প্রথম একটা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। ১৯৩৭ সালের ১৫ জানুয়ারী প্রতিষ্ঠা করেন ভবেরচর হাই স্কুল। এই স্কুল প্রতিষ্ঠার ফলে গজারিয়া এলাকায় শিক্ষার আলো ছড়াতে থাকে।

জন্ম

গরীব হোসেন চৌধুরীর জন্ম সম্ভাব্য ১৮৯০ সালে, পুরান বাউশিয়া গ্রামে। তার পৈত্রিক বাড়ী তৎকালীন দাউদকান্দি থানার পাতালেরচর গ্রামে। তার বাবা বশির উদ্দিন সিক্‌দার ঘোড়ায় চড়ে পাখি শিকার করতে এসে পুরান বাউশিয়া গ্রামের ধনাঢ্য জাহাঙ্গীর সরকারের কনিষ্ঠ কন্যা আলমজানকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর বশির উদ্দিনকে ঘরজামাই রাখা হয়। এই ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন গরীব হোসেন, মোহাম্মদ হোসেন, গোলাম হোসেন, তোফাজ্জল হোসেন ও ছলিমন নেসা।

পড়াশোনা

প্রথমবার এন্ট্রান্স পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছিলেন। তাই তার মামা দায়েমউদ্দিন সরকার তাকে পড়াশোনার খরচ পাঠাতে নিরুৎসাহিত হন। ফলে বাধ্য হয়ে তিনি মনাইরকান্দি গ্রামে ধনাঢ্য মাওলানা আফতাফ উদ্দিনের মেয়ে আয়েশা বেগম সূর্যবানকে বিয়ে করেন। শ্বশুরের আর্থিক সহায়তায় পরের বছর সম্ভবত ১৯০৮ সালের মুন্সিগঞ্জ হাই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি আইএ পাস করেন।

কর্মজীবন

তিনি প্রথমে পুলিশ বিভাগে যোগ দেন। কিন্তু এই চাকরি তার বেশী দিন ভালো লাগল না। তাই তিনি ঢাকা কোর্টে পেশকার হিসেবে পেশাগত জীবন শুরু করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি অনেক অর্থসম্পদের মালিক হন। বিশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা কালেক্টরির ৫০৫ নম্বর তৌজির বেশ কিছু সম্পত্তি নিলামে ক্রয় করে তিনি জমিদার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। অর্থবিত্তের মালিক হওয়ার পর নামের শেষে চৌধুরী উপাধি ব্যবহার করতে থাকে। ১৯৩৪ সালে তিনি পুরান বাউশিয়া গ্রামের "গরীব মঞ্জিল" নামে একটি দ্বিতল অট্টালিকা নির্মাণ করেন। পেশাগত কারণে গরীব হোসেন চৌধুরী পুরান ঢাকার কলতবাজারে বসবাস করতেন। তার কলতাবাজারের বাড়িটি ছিল যেন একটি অতিথিশালা। এখানে থেকেই তার আত্মীয়স্বজন লেখাপড়া করতেন।

মৃত্যুবরণ

গরীব হোসেন চৌধুরী খুবই ভোজনরসিক ছিলেন। তিনি খুব খেতে পারতেন ও মানুষকে খাওয়াতে পছন্দ করতেন। মধ্যবয়সেই তিনি ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হন। গরীব হোসেন চৌধুরী আমৃত্যু গজারিয়ার শিক্ষার জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। অথচ তার বর্ণ্যাঢ্য জীবনের নানা তথ্য অতলে অন্তরীণ। পুরান বাউশিয়ায় গরীব মঞ্জিলের পাশের একটি সাধিতে শায়িত আছেন গরীব হোসেন চৌধুরী। তাতে লেখা-মৃত্যু ৮ ফাল্গুন ১৩৫১ বঙ্গাব্দ (২০ ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫ খ্রিষ্টব্দ)।

উত্তরাধিকার

গরীব হোসেনের প্রথম স্ত্রী নিঃসন্তান ছিলেন। তাই তিনি নিজ গ্রামের মৌলভি তমিজ উদ্দিন দেওয়ানের মেয়ে আলতাফুন নেসাকে বিয়ে করেন। সেই ঘরে নূরজাহান বেগম ও জাহানারা বেগম নামে দুই কন্যা ও এক পুত্র জন্ম লাভ করেন। তার জীবদ্দশায়ই শিশুপুত্র মারা যান।

মনির হোসেন জাহাঙ্গীর

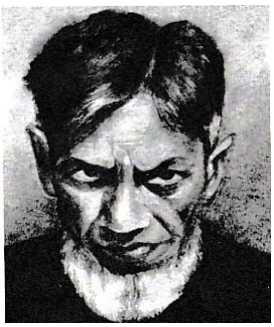

মনির হোসেন জাহাঙ্গীর একজন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, গজারিয়ার প্রাণপুরুষ। তিনি সামান্য ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট থেকে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের হয়ে এমএলএ নির্বাচিত হয়েছিলেন। গজারিয়ার স্থাপিত পুলিশ ফাঁড়িকে থানায় রূপান্তরে তার অবদান অপরিসীম। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহা সড়ক গজারিয়ার ওপর নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি ১৯৫৬ সালে তিনি প্রাদেশিক সংসদে প্রস্তাব করেন।

জন্ম ও পড়াশোনা

তিনি ১৮৯৯ সালের শ্রাবণ মাস শুক্রবারে মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার পুরান বাউশিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা দায়েমউদ্দিন প্রথম জীবনে ঢাকায় এক জমিদারের নায়েব ছিলেন। পরে তিনি বেশ কয়েকবার বাউশিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হন। দাদা জাঁহাঙ্গীর সরকার ছিলেন বিশাল ধন-সম্পদের মালিক। তার মায়ের নাম আক্রামুন নেসা। বাবা-মায়ের প্রথম সন্তান বলে সবাই আদর করে নামে রাখেন মনি। পরে দাদার নামের সঙ্গে মিল রেখে তার নাম রাখা হয় মনির হোসেন জাহাঙ্গীর। তার শৈশব কাটে গ্রামের বাড়িতে। ১৯২২ সালে ম্যাট্রিক পাস করেন। ঢাকা কলেজ থেকে ১৯২৪ সালে আইএ পাস করেন। ১৯২৬ সালে আলীগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস বিভাগে বি.এ পাস করেন।

ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবন

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে আমাদের দেশের শিক্ষিত ছেলেরা কার্যত ছিলেন বেকার। তিনি ১৯২৭ সালের পর থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত বেকার সময় কাটান। ১৯২৮ সালে কুমিল্লার দেবীদ্বার উপজেলার গঙ্গামঙ্গল পরগনার জমিদার সায়েদ আলী ভূঁইয়ার দ্বিতীয় কন্যা জোবেদা খানমকে বিয়ে করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি কো-অপারেটিভ ম্যানেজার হিসেবে কর্মে যোগন দেন। এই সময় তিনি ঢাকার কলতাবাজারে বসবাস করতেন। এরপর তিনি মুর্শিদাবাদের একটি স্কুলে দুই বছর শিক্ষকতা করেন।

রাজনৈতিক জীবন

মুর্শিদাবাদ থেকে ফিরে এসে গণপ্রতিনিধিত্বমূলক পেশায় যোগ দেন। তিনি ১৯৪০ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তিন দফা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর জাতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের ঋণসালিসি বোর্ড ও কৃষক মুক্তির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কৃষক শ্রমিক পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে ঢাকা ১৬১ নম্বর আসন থেকে এমএলএ নির্বাচিত হন। তার আগে গজারিয়ার কোনো ব্যক্তি জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ পাননি।

চারিত্রিক বৈশিষ্ট

ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সরল প্রকৃতির মানুষ। তার জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট গ্রামের সহজ-সরল মানুষদের ভালোবাসা। তাই সারা জীবন মানুষের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করেছেন। তিনি সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন ধৈর্যশীল, বন্ধুবৎসল ও অন্যের প্রতি আস্থাশীল। খুব অল্পতেই সন্তুষ্ট হতেন। আবার অন্যায় দেখলে কঠোর মনোভাব প্রকাশ করতেন। শেষ জীবনে তিনি তার গ্রামের মাইনর স্কুলটিকে হাই স্কুলে রূপান্তরে প্রধান উদ্যোক্তা হিসেবে কাজ করেন। তিনি স্কুল ভবন নির্মাণ ও আনুষাঙ্গিক অর্থ প্রদান করেন। শুরুতে শিক্ষকদের ঠিকমতো বেতন দিতে পারতেন না বলে নিজেই অবৈতনিক শিক্ষক হিসেবে ক্লাস নিতেন।

কাব্যচর্চা

শিক্ষক ও রাজনীতিবিদ ছাড়াও তিনি ছিলেন স্বভাব কবি। তিনি নিয়মিত ডায়েরি লিখতেন। তার অনেক লেখার হদিস নেই। প্রিয় ভূমি গজারিয়াকে নিয়ে লিখেছেন বেশ কয়েকটি কবিতা। ১৯৩৮ সালের ১৮ জুলাই ঢাকার ৯১ নম্বর কলতাবাজারে বসে নিজ এলাকার সৌন্দর্য বর্ণনা করে তিনি লিখেছেন-

নদনদী ধৌত স্নিগ্ধ মেঘনা অঞ্চলে
উর্বর মাটিতে যার শস্যে সোনা ফলে
সম্পদ আকর যেথা সর্ব জলস্থল
কল্পনার লীলাভূমি প্রকৃতির কোল

শেষ জীবন

জীবনের শেষ বেলায় তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পরেন। এই সময় তিনি সর্বদা আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিত থাকতে চাইতেন। ১৯৬৭ সালের ২১ মে বাদ আসর নিজ বাড়িতে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছির ৬৯ বছর। পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার আগে তিনি একটি টিনের ঘর ছাড়া আর কিছুই রেখে যেতে পারেননি। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে তার নাম সেভাবে স্থান না পেলেও তিনি বেঁচে থাকবেন তার প্রিয় মানুষের মাঝে। বাউশিয়া এম এ আজহার উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন মনির হোসেন জাহাঙ্গীর।

ডা. আবদুল গফ্ফার খান

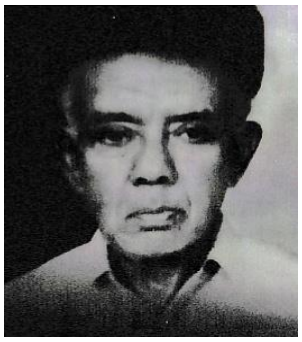

ডা. আবদুল গফ্ফার খান গজারিয়ার একজন নক্ষত্র সমতুল্য ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার পূর্বপুরুষ এনাম মুহাম্মদ আফজাল মুনশি ১২০০ হিজরিতে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য পারস্য থেকে এ দেশে আগমন করেন। পীরালি বংশের লোক হিসেবে তিনি একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। বহু বন্ধুর পথ অতিক্রম করে তিনি সাফল্যের চূড়ায় পৌছান।

জন্ম ও পড়াশোনা

ডা. আবদুল গাফ্ফার খান ১৯০২ সালে গজারিয়া উপজেলার বালুয়াকান্দি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। নিজ এলাকায় ভাল স্কুল না থাকায় ১২ মাইল দূরে তৎকালীন মতলব থানার ছেঙ্গারচর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই স্কুল থেকে তিনি ১৯১২ সালে পরেশনাথ কৃত্তিনিবাস মেডেল, মেধাবৃত্তিসহ প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৯১৯ সালে তিনি ঢাকার মুসলিম হাই স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পাস করেন। ১৯২৩ সালে ঢাকা কলেজ থেকে আইএ পরীক্ষায় সমগ্র কলকাতায় মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে মেধাতালিকায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেন।

সংগ্রামী জীবন

আইএ পাসের পর তিনি মানবকল্যাণের ব্রত নিয়ে ডাক্তারি পড়ার আকাঙ্খা মনে ধারণ করেন। সে সময় মুসলমান ছাত্রদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণে বেশ প্রতিবন্ধকতা ছিল। এছাড়া পিতার অর্থ সামর্থ্য না থাকায় তার এই স্বপ্ন ফিকে হতে থাকে। তার পিতা মুনশি ইয়াকুব আলী খান ছিলেন মুন্সিগঞ্জ মহকুমা আদালতের একজন নিম্ন পদস্থ কর্মচারী। তাই পুত্রকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে পড়ানো তার কাছে অনেকটাই দুঃস্বপ্ন। অবশেষে তিনি শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের শরণাপন্ন হন। মেধাবী ছাত্র হিসেবে শেরে বাংলা একটি পত্র লিখে তাকে কলকাতায় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কাছে পাঠান। তিনি সুপারিশ করেন। অর্থ সংকটের কারণে কলকাতায় বিভিন্ন বাড়িতে লজিং থেকে তাকে পড়াশোনা চালাতে হয়। লজিং বাড়িতে রাত ৯ টার পর আলো নিভিয়ে দেওয়া হতো বলে তিনি ফুটপাতের আলোয়ে গভীর রাত পর্যন্ত লেখাপড়া করতেন। কোনদিন ছাত্র অনুপস্থিত থাকলে

সেদিন তাকে খাবার দেওয়া হতো না। এই সময় তিনি পানি খেয়ে থাকতেন। ১৯২৬ সালে পড়াশোনার খরচ চালাতে পারিবারিক চাপে তিনি বিয়ে করতে বাধ্য হন। তার শ্বশুর ছিলেন তৎকালীন রাজশাহীর সারদা পুলিশ একাডেমির পদস্থ কর্মকর্তা। ১৯৩০ সালে তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এম.বি.বি.এস পাস করেন। ১৯৩২ সালে এম.বি.বি.এস (ক্যাল) ইন্টার্নশিপ সমাপ্ত করেন তৎকালীন ইন্ডিয়া মেডিকেল কাউন্সিল থেকে ডাক্তারি সনদ লাভ করেন।

পেশাগত জীবন

ডা. খান ১৯৩৪ সালে নিজ শিক্ষক প্রফেসর জি হাট-এর পরামর্শে কলকাতায় চব্বিশ পরগনার মেটিয়াবুরুজে প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করেন। মেটিয়াবুরুজে তখন কোন ভালো ডাক্তার ছিল না। তাই অল্প কিছু দিনের মধ্যেই মেটিয়াবুরুজ থেকে আক্রা, টাটানগর ও আলীপুরা পর্যন্ত তার নামডাক ছড়িয়ে পড়ে। তার চিকিৎসায় লোকজান আরোগ্য লাভ করতেন। তাই মানুষ তাকে দেবতুল্য মনে করতেন। এই এলাকার মানুষ তাকে গাফ্ফার ডাক্তার বলে একনামে চিনত। পেশাগত কারণে কলকাতায় বসবাস করলেও নিজ এলাকার মানুষদের চিকিৎসাসেবা দেওয়ার জন্য তিনি প্রায় গজারিয়ায় আসতেন।

জমিদারি ক্রয়

তিনি কলকাতায় প্রাইভেট প্রাকটিস করে বিশাল ধনসম্পদের মালিক হন। মেটিয়াবুরুজ তিনি বিশাল এক বাগানবাড়ি ক্রয় করে একতলা সুরম্য বাসগৃহ নির্মাণ করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি ৪৯৫ ও ৫০৫ নং তৌজির জমিদারি কিনে গজারিয়া জমিদার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। সে সময়ে তিনি বালুয়াকান্দিতে অনেক ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন। ১৯৫১ সালে তিনি ভাটেরচর হাট প্রতিষ্ঠা করেন। হাটে দোকান বসানোর জন্য প্রত্যেক দোকানদারকে প্রণোদনা হিসেবে মাসিক ১০ (দশ) টাকা প্রদান করতেন। এই হাট এখন ভাটেরচর বাজার হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম

১৯৪৬ সালে কলকাতায় গজারিয়া জনকল্যাণ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এর মাধ্যমে তিনি গজারিয়া এলাকার অবকাঠামো উন্নয়নে প্রভূত অবদান রাখেন। তিনি ঢাকা- চট্টগ্রাম মহাসড়কের প্রস্তাবিত গতিপথ সোনারগাঁওয়ের বৈদ্যারবাজার থেকে পরিবর্তন করে গজারিয়ার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার ব্যবস্থা করেন। এই সড়ক বাস্তবায়নের জন্য তিনি তার ২০ বিঘা জমি সরকারের বরাবরে অর্পণ করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি বালুয়াকান্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রাবেয়া খাতুন মেমোরিয়াল মাদ্রাসা ও কবরস্থান প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৮ সালে ভাটেরচর দে এ মান্নান বহুমূখী উচ্চ বিদ্যালয়ের জন্য তিনি ০.৭০ একর জমি দান করেন। ঢাকার আজিমপুর নতুন পল্টন এলকায় নিজ বাসভবনের পাশে আলহেরা জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠায় তিনি জমি ও অর্থ দান করেন। একজন দানশীল ব্যক্তি হিসেবে তিনি গজারিয়ার বহু শিক্ষার্থীকে অর্থ সাহায্য করেন।

উত্তরাধিকার

ডা. খানের প্রথম স্ত্রী মোসাম্মৎ রাবেয়া খাতুনের গর্ভে ১৯২৭ সালে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই পুত্রের ছয় বছর বয়সে তার স্ত্রী ইন্তেকাল করেন। পরবর্তী সময়ে শ্বশুরের আদেশে মরহুমা স্ত্রীর খালাতো বোন মোসাম্মৎ মহসেনা বেগমকে বিয়ে করেন। এই স্ত্রীর গর্ভে অপর ০৫ পুত্র ও ৪ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তারা সবাই এখন সমাজের উচ্চ স্তরে প্রতিষ্ঠিত। তার পুত্ররা হলেন-কর্নেল এএফএম আবদুর রব, ডা. এএইচএম সাইদুল ইসলাম, কর্নেল (ডা.) এএইচএম শফিউল ইসলাম, কর্নেল এএমএম সাদেদুল ইসলাম (মরহুম), প্রকৌশলী এএসএম হাফিজুর রহমান, বিচারপতি এএফএম আবদুর রহমান। বালুয়াকান্দিতে তারা পিতার নামে ডা. আবদুল গাফ্ফার উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

মৃত্যুবরণ

ডা. খান ১৯৮৯ সালের ৬ জুলাই ঢাকায় নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। মানবসেবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে ডা. আবদুল গাফ্ফার খান গজারিয়ার মানুষের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

সিরাজ-উদ্-দৌলা খান

সিরাজ-উদ্-দৌলা খান ছিলেন তৎকালীন মুন্সিগঞ্জ মহকুমার এক প্রবাদ পুরুষ। তিনি এসডি খান নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। কলকাতায় অবস্থিত বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটের একজন সামান্য উচ্চমান সহকারী পদ থেকে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সচিবালয়ের অন্যতম শীর্ষ পদে সমাসীন হয়েছিলেন। সততা, দক্ষতা, নিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের গুনেই তার পক্ষে এই বিরল উন্নতি অর্জন সম্ভবপর হয়েছিল। কিশোর বয়স থেকেই তিনি সমাজসেবামূলক মনোভাবাপন্ন ছিলেন। তার জীবনের ব্রত ছিল অকাতরে মানুষের সেবা করা। সেই কারণেই তিনি পরিণত বয়স কলকাতা প্রবাসীদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন গজারিয়া জনকল্যাণ সমিতি। তিনিই গজারিয়ার মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রকৃত নায়ক।

শৈশব ও শিক্ষাজীবন

জনাব খান ১৯০৮ সালের ২৩ জুলাই মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার ভাটিবলাকী গ্রামের প্রসিদ্ধ খান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা সমশের আল খান ১৯২০ সাল থেকে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত হোসেন্দী ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। মাত্র পাঁচ মাস বয়সেই এসডি খান তার মাকে হারান। ১৯১৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর পাঁচ বছর বয়সে গ্রামের মক্তবে শিক্ষার হাতেখাড়ি শুরু হয়। গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিন বছর পাঠ শেষ করে ১৯১৯ সালে গজারিয়া মিডল ইংলিশ স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হন। এখানে তিনি ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। ১৯২২ সালে ঢাকার মুসলিম হাই স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুল থেকে ১৯২৬ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে মাধ্যমিক বোর্ডের বৃত্তি লাভ করেন। এই স্কুলে পড়াকালীন তিনি মেধাবী ছাত্র হিসেবে হাজ্বী মোহাম্মদ মহসীন বৃত্তি লাভ করেন। ১৯২৮ সালে ঢাকা ইন্টরমিডিয়েন্ট কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আইএ পাশ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিত শাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বিএ ক্লাসে ভর্তি হন। শারিরীক অসুস্থতার কারণে ১৯৩১ সালে পরীক্ষা দিতে না পারায় পরের বছর বিএ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

পেশাগত জীবন

ফলাফলের আগেই ১৯৩২ সালে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় মুসলমানদের মধ্যে প্রথম হয়ে তদানীন্তন বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে যোগ দেন। ১৯৩৪ সালে তিনি বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩৫ সালে স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসন দপ্তরে আপার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োজিত হন। ১৯৪২ সালে এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং ১৯৪৫ সালে হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে সমাসীন হন। ১৯৪৬ সালে গেজেটেড অফিসার হিসেবে এই দপ্তরের রেজিস্ট্রার হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৪৭ সালে সহকারী সচিব হিসেবে পদোন্নতি পান। দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান সরকারের স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্ত্বশাসন দপ্তরের সহকারী সচিব হিসেবে যোগ দেন। তার কাজের উৎকর্ষতার গুণে ১৯৪৯ সালে ওই বিভাগের উপসচিব পদে উন্নীত হন। ১৯৫৭ সালে স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসন দপ্তরের সাথে মৌলিক গণতন্ত্র বিভাগ যুক্ত হওয়ায় তাকে উপ-সচিব পদের পাশাপাশি স্পেশাল অফিসার হিসেবেও নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৯৬৩ সালে একই বিভাগে তিনি যুগ্ম সচিব হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন। ১৯৬৯ সালের ১ জুন তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

অর্জন

এসডি খান ১৯৫২ সালে স্বায়ত্ত্বশাসন ও সমাজকল্যাণ বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য জাতিসংঘের একটি ফেলোশিপ নিয়ে মিসর ও শ্রীলংকায় শিক্ষাসফরে যান। ১৯৬২ সালে পশ্চিম জার্মনীর বার্লিনে অনুষ্ঠিত স্বায়ত্ত্বশাসনের ওপর আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। ফেরার পথে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান চাক্ষুষভাবে দেখার জন্য হল্যান্ড, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য সফর করেন। সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে দেশের প্রতি অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার তাকে ১৯৬২ সালে "তম্‌গাহ্-ইকায়েদে আজম" ও ১৯৬৭ সালে "তম্‌গাহ্-ই-পাকিস্তান খেতাবে ভূষিত করে।

জনকল্যাণ সমিতি গঠন

১৯৪৬ সালে কলকাতাপ্রবাসী গজারিয়ার সুধীজনদের নিয়ে গজারিয়া জনকল্যাণ সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে তিনি এই সমিতির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু করে দীর্ঘ ২০ বছর সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম

তিনি সারা জীবন গজারিয়াকে বুকে ধারণ করেছেন। সমিতি করতে গিয়ে গজারিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুরে বেড়িয়েছেন। মানুষের কাছেও তার গ্রহণযোগ্যতা ছিল। কলকাতায় চাকরি করার সময় তিনি নিজ এলাকার অল্প শিক্ষিত ছেলেদের জন্য বহু চাকরির ব্যবস্থা করেন। সরকারের সুউচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থাকার কারণে তিনি নিজ এলাকার যুবকদের ডেকে ডেকে চাকরি দিতেন। তার এই জনসেবা এলাকাবাসীর মুখে মুখে উচ্চারিত হতো। এলাকায় দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে গজারিয়াকে থানায় রূপান্তর প্রতিটি কাজেই তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি হোসেন্দী মিডল ইংলিশ স্কুলকে উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত করেন। তিনি গজারিয়া মডেল হাই স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোক্তা। তিনি নিজের গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মসজিদ নির্মাণের জন্য জমিদান ও আংশিক অর্থ সাহায্য করেন। শেষ জীবনে গজারিয়ায় একটি হাসপাতাল নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। হাসপাতালের জমি কেনার অর্থ সংগ্রহ করার জন্য দ্বারে দ্বারে চিঠি লিখেছেন, ঘুরে বেড়িয়েছেন। ভবেরচরে জমি কেনার পর ১৯৭৮ সালে এখানে সরকারী পর্যায়ে গজারিয়া স্বাস্থ্য প্রকল্প স্থাপতি হয়।

পারিবারিক জীবন

এসডি খান ১৯৩৬ সালে দাউদকান্দি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আরশাদ আলী সরকারের জেষ্ঠ কন্যা মোসাম্মৎ জাহান আরা খানমকে বিয়ে করেন। তিনি চার পুত্রের জনক। জ্যেষ্ঠ পুত্র শামস্-উদ্- খান বাংলাদেশ টেলিভিশনের সাবেক প্রধান প্রকৌশলী। দ্বিতীয় পুত্র শরিফ-উদ্-দৌলা খান কনসাল্টটেন্ট প্রকৌশলী। তৃতীয় পুত্র সফিক-উদ্-দৌলা খান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গবেষণাকার্যে যুক্ত।

শেষ ইচ্ছা

মৃত্যুর মাস দেড়েক আগে এসডি খান স্ত্রী ও পুত্রদের নিয়ে গ্রামের বাড়িতে যান। পাশের গ্রামে বাবার কবর জিয়ারতের পর নিজ গ্রামের মসজিদের পাশে নিজের কবরের স্থান দেখিয়ে দেন। তার এই ইচ্ছা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে নিজ ভূমিকে তিনি কতখানি ভালোবাসতেন।

মৃত্যুবরণ

১৯৭৫ সালের ২ মে রাত সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে হৃদ্‌ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার এই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে গজারিয়ার একটি নক্ষত্রোজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের কর্মময় ও ঘটনাবহুল জীবনের অবসান হয়। এসডি খানের ইচ্ছা অনুযায়ী তার নশ্বর দেহ ভাটি বলাকী গ্রামের মসজিদের পাশে সমাহিত করা হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, সেই গ্রাম এখন গহিন মেঘনায়।

জালাল উদ্দিন খাঁ

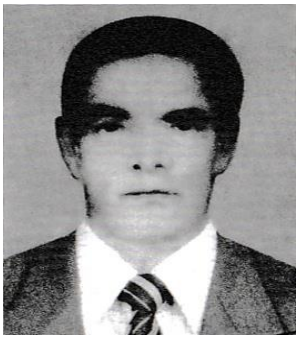

জালাল উদ্দিন খাঁ ছিলেন একজন আত্মসন্ধানী লোককবি। লোকজন তাকে জগা বয়াতি হিসেবেই চিনতেন। গ্রামে সহজ-সরল মানুষ তার মারফতি ধারার গান অন্তর দিয়ে উপভোগ করত। গানের কারণেই তিনি সাধারণের হৃদয়ের কাছাকাছি মানুষ। তার জ্ঞান হিরন্ময় দীপ্তি ছড়িয়ে অস্তাচলে ডুবে গেলেও অসামান্য প্রতিভাধর এই লোককবির নাম চিরদিন শ্রদ্ধাভরে স্মরণযোগ্য। গজারিয়া সাংস্কৃতিক বিকাশে তার ছিল অসামান্য অবদান। বাংলাদেশের সঙ্গীতাঙ্গনে তিনি ছোট জালাল হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

শৈশব জীবন

জালাল উদ্দিন খাঁ আনুমানিক ১৯২২ সালে গজারিয়া উপজেলার ষোলআনি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তার বাবা ছোয়াব আলী খাঁ ছিলেন কৃষক। কিন্তু তিনি নিয়মিত পুঁথি পাঠ করতেন, কিচ্ছা-কাহিনী বলতেন। তার মায়ের নাম মাহমুদা বেগম। এক মায়ের এক ছেলে বলে তাকে সবাই ডাকতেন জগা। জালাল উদ্দিন খাঁ গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে সামান্য পড়েছেন। ছোট বেলা থেকেই অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন। গ্রামে প্রাইমারী স্কুলে চতুর্থ শ্রেনী পর্যন্ত পড়েছেন। বাড়ীর পাশের হাফেজ মাওলানা আবদুল কাদের নূরীর কাছ থেকে সুরা-কালাম, মরিয়ত-মারফত সম্পর্কে জেনেছেন। আগে ষোলআনি গ্রামে প্রায় ফকিরি গানের আসর করত। অনেক গুণী বাউল শিল্পী আসতেন সেই আসরে। আলাউদ্দিনের সেই আসর ভালো লাগত। গজারিয়ার চর কিশোরগঞ্জ গ্রামের ওসমান গনি বয়াতির কাছে তার সংগীতের হাতেখড়ি। ওসমান আলী খুব বড় শিল্পী ছিলেন না। তবু তিনি আমৃত্যু ওসমান গনিকে গুরু বলে মানতেন।

মর্মানুসন্ধানী লোককবি

পালা গানের জন্য বিখ্যাত ছিলেন আলাউদ্দিন। তিনি দুই শয়ের বেশী গান রচনা করেছেন। হাবিবুর রহমান নূরী নামের এক সতীর্থ তার গানগুলো লিখে রাখতেন। "ভক্তের খোরাক", "বিচার সংগীত" ও "জ্ঞানের ভান্ড" নামে তার তিনটি পান্ডুলিপি রচিত হয়েছিল। মানুষের মুখে মুখে তার গানগুলো গীত হচ্ছে। তার আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না। তবু অর্থের টানে তিনি গান গাইতেন না। সারা জীবন গান গেয়েছেন প্রাণের টানে। প্রচারের মোহ ছিল না। ফলে অতলে হারিয়ে গেছে এই লোককবির নাম। লোকায়ত ধর্মের মর্মনুসন্ধানী এই মানুষটি লোকজীবনের সব কিছুর সঙ্গেই নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন। তার সংগীত সাধনা, যাপিত জীবন ও জীবনদর্শন একই সূত্রে গাঁথা। তার রচিত উল্লেখযোগ্য একটি গান হলো-

আমি কেবা তুমি কেবা
জানতে হুকুম কইতে মানা
আমার তোমার হইলে বিচার
কে করবে কার উপাসনা?
আমারই ঘর আমার বাড়ি
তুমি করলা বসতবাড়ি
আমি কেবা কইতে নাড়ি
তুমি বিনে আমি কিছু না।

মায়ের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধশীল। ছন্নছাড়া জীবনেও মাকে এক মুহূর্তের জন্য ভোলেননি। মাকে নিয়ে লিখেছেন-

মা, আমি তোমার পাগলা ছেলে
তোমার নাম ভুলে গিয়েছি
পড়িগয়া কামিনীর ভুলে
মা, আমি তোমার পাগলা ছেলে।
মনে হইলে মা তোমার কথা
স্বর্গমর্ত পাতাল ব্যাথা
সব ভুলে যাই তোমায় দেখলে। ঐ
এমন মা ঘরে থাকিলে
হজ হবে না মক্কা গেলে
মায়ের দোয়া থাকলে দিলে
আল্লাহ রসুল ঘরে মিলে। ঐ

জীবনের প্রায় পুরোটা সময় বাউলের আসরে কাটিয়েছেন। গানের আখড়ায় সর্বদা তার ব্যথিত হৃদয় খুঁজে পেত সুশীতল ছায়া। সেই কারণেই তিনি বোধ হয় কখনো শৈশয়িত হতে পারেননি। গানের মধ্যেই ডুবে ছিলেন এই স্বভাবী শিল্পী। গানের সময় তিনি দোতারা বাজাতেন। দোতরায় আঙুল দিয়ে এমন সুর তুলতেন যে মানুষ মন্ত্রমুগ্ধের মতো জড়ো হয়ে যেত। তিনি খেমটা তালে গান গাইতেন। পালাগানে তার পরিবেশনা ছিল উপভোগ্য। তিনি প্রায় হাজেরা বিবির সঙ্গে পালা গাইতেন। এছাড়া তিনি মানিকগঞ্জের রজ্জব আলী দেওয়ান, আবুল সরকার, ঢাকার খালেক দেওয়ান, মালেক দেওয়ান, আলেক দেওয়ান, আবদুর রহমান বয়াতি, নেত্রকোনার জালাল উদ্দিন খাঁ, মারফত আলী বয়াতি, ফরিদপুরের হালিম বয়াতির সঙ্গে পালা করে গান গাইতেন।

শেষ জীবন

সারা জীবন গান-বাজনায় বিভোর ছিলেন। অর্থকে তুচ্ছ মনে করতেন। কিন্তু রুচিশীল ও রাজকীয় চলাফেরা ছিল তার। পরিচ্ছন্ন থাকতে পছন্দ করতেন। তিনি আজীবন নিষ্ঠাবান ছিলেন। ফলে শেষ জীবন চরম দৈন্যের মধ্য দিয়ে কাটে। তার প্রথম স্ত্রী নাম বানু বেগম। শেষ স্ত্রীর নাম হামিদা বেগম। হুমায়ূন কবীর নামে তার একছেলে ও লায়লা বেগম, সুরাইয়া বেগম এবং সুলতানা নাসরীন নামে তিন মেয়ে আছে। মানুষের আবেগকে নাড়া দেওয়া এই বয়াতি ১৯৯৭ সালে ১৯ ডিসেম্বর শ্বাস কষ্টে মারা যান। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল প্রায় ৭৫ বছর। নারায়নগঞ্জের বন্দরে তা সামধী রয়েছে।

শহীদ নজরুল ইসলাম

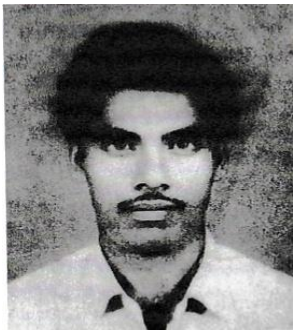

একেএম নজরুল ইসলাম মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী। যুদ্ধকালীন সময়ে তিনি বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স বা বিএলএফের গজারিয়া থানা কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালের ৯ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে তিনি শহীদ হন। তার গ্রামের বাড়ি মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলার চরবাউশিয়ার ফরাজীকান্দিতে।

জন্ম ও পড়াশোনা

তার জন্ম ১৯৪৯ সালের ১৫ অক্টোবর মুন্সিগঞ্জ সদর উপজেলার চর রমজানবেগ গ্রামে। জন্মের পর তার নাম রাখা হয় নজরুল ইসলাম। ডাক নাম কিরণ। তার বাবা আক্রাম আলী ও মা আছিয়া খাতুন শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। নজরুল ঢাকার আজিমপুর ওয়েস্ট অ্যান্ড হাই স্কুল থেকে ১৯৬৭ সালে প্রথম বিভাগে এসএসসি পাশ করেন । ১৯৬৯ সালে জগন্নাথ কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এইচএসসি পাশ করেন। ১৯৬৯ সালে একই কলেজের স্নাতক বিভাগে ভর্তি হন। এই বছরই জগন্নাথ কলেজ ছাত্রলীগ শাখার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তখনকার দিনে জগন্নাথ কলেজে তার মতো পরিশ্রমী কর্মী ছিল বিরল। সভায় বক্তব্য দেওয়া, রাত জেগে পোষ্টার লেখা থেকে শুরু করে পোষ্টার লাগানো পর্যন্ত বিভিন্ন প্রতিবাদী কর্মকান্ডে তিনি ছিলেন সোচ্চার।

যুদ্ধকালীন কমান্ডার

কিছু সময় বাড়িতে থেকে তিনি পাড়ি জমান ভারতে। সেখানকার উত্তর প্রদেশের চাক্রাতা হিল ট্রাক্টস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এক মাস গেরিলা ট্রেনিং করেন। ট্রেনিং শেষে বিএলএফের গজারিয়া থানা কমান্ডার হয়ে নিজ এলাকায় আসেন। এই সময় তিনি ঢাকাভিত্তিক মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে চর এলাকায় বিভিন্ন গেরিলা অপারেশন চালান। কিন্তু অস্ত্রের মজুদ শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে অক্টোবর মাসে পুনরায় ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় চলে যান। কিন্তু ভাগ্য তাকে আবারো নিয়ে যায় চাক্রাতা হিল ট্রাক্টস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। তবে প্রশিক্ষণের জন্য নয়,প্রশিক্ষক হিসেবে। ৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় এসএলআর, এলএমজি, রিভলবারসহ অজস্র গোলাবারুদসহ তিনি নিজ গ্রামে আসেন। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওই রাতেই বাউশিয়া ফেরিঘাটে অবস্থিত হানাদার বাহিনীর ক্যাম্পে হামলা চালান।

সমাধি

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের বাউশিয়া ফেরিঘাটে তাকে সমাহিত করা হয়। তার স্মরনে চরবাউশিয়া গ্রামে আছে শহীদ নজরুল স্মৃতি সংসদ,শহীদ নজরুল অক্ষয় ভান্ডার। অতি সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা নজরুল ইসলাম উচ্চ বিদ্যালয়। স্বাধীনতার পর শহীদ নজরুলের নামে টিপু সুলতান রোডে জগন্নাথ কলেজের একটি ছাত্রাবাসের নামকরণ করা হয়। ১৯৮৫ সালের পর থেকে হলটি অরক্ষিত।

গজারিয়ার অন্যান্য পথিকৃত

সৈয়দ গোলাম মোস্তফা আল হুসেনী ছিলেন ফারসি ভাষায় খুব উচুঁমানের লেখক ও সাহিত্যিক। দীর্ঘদিন ছিলেন ঢাকার অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট। উনিশ দশকের মাঝামাঝি সময়ে তিনি ছিলেন গজারিয়ার আশ্রাব্দী এলাকার জমিদার। আবদুল হক মকবুলোজ্জোহা চৌধুরী ছিলেন একজন প্রজাহিতৈষী জমিদার। ১৯৩৬ সালে হোসেন্দীতে প্রতিষ্ঠা করেন এমজেডইউবি চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি। এটিই গজারিয়ার প্রথম দাতব্য চিকিৎসালয়। সৈয়দ আবু নাসের মাহফুজ উল্লাহ ছিলেন একজন দরদি জনপ্রতিনিধি। দীর্ঘদিন ছিলেন গজারিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান। তিনিই গজারিয়া থানা আওয়ামী লীগের প্রথম সভাপতি। অধ্যাপক মুয়ায্য হুসায়ন খান একজন খ্যতিমান গবেষক ও ইতিহাসবিদ তিনি ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের গজারিয়া শাখার সভাপতি ছিলেন। অধ্যাপক কে এম শামসুল হুদা একজন রাজনীতিবিদ। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে রিক্রুটিং অফিসার ছিলেন। ১৯৭০ সালের প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। আলহাজ মোহাম্মদ কলিমউল্লাহ ও মেজর (অব.) জসীম উদ্দিন ছিলেন সাবেক গজারিয়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান। গজারিয়ায় উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নে তাদের অবদান অসামান্য। এএফএম আবদুর রহমানের সম্পাদনায় ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হয় মাসিক গজারিয়া উপজেলা সমাচার। এটিই গজারিয়ার প্রথম সংবাদপত্র।

গজারিয়ার কৃতী মানুষের সংখ্যা অনেক। সবাই স্বমহিমায় উজ্জ্বল। অসংখ্য কৃতি মানুষের ভিড়ে এই কয়েকজন বরণীয় ব্যক্তির প্রতিকৃতি সন্নিবেশিত হলোঃ

কে এম শামসুল হুদা
জন্ম : ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯
মৃত্যু : ১৫ ডিসেম্বর ২০১০

আলহাজ মোহাম্মদ কলিমউল্লাহ
জন্ম : ২৪ জুলাই ১৯৪০

সৈয়দ গোলাম মোস্তফা আল হুসেনী
জন্ম : ১৭ সেপ্টেম্বর ১৮১৭
মৃত্যু : ১৭ ডিসেম্বর ১৯০৭

আবদুল হক মকবুলোজ্জোহা চৌধুরী
জন্ম : ১৬ জুন ১৮৯৪
মৃত্যু : ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪

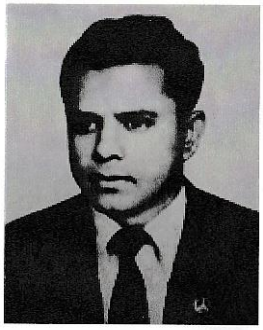

প্রকৌশলী মেজর (অব.) জসীম উদ্দিন
জন্ম : ১১ জানুয়ারি ১৯৪৮

বিচারপতি এএফএম আব্দুর রহমান
জন্ম : ৫ জুলাই ১৯৫১

সৈয়দ মাহফুজ উল্লাহ
জন্ম : ১৯০০
মৃত্যু : ১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪

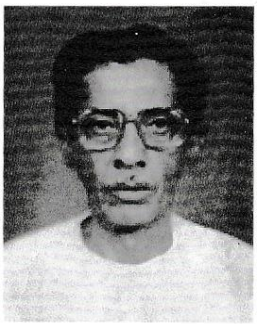

অধ্যাপক মুয়ায্যম হুসায়ন খান
জন্ম : ১৫ ডিসেম্বর ১৯৩৫
মৃত্যু : ২৫ আগস্ট ২০১২

পর্যটনশিল্প

নৈসর্গিক সৌন্দর্য গজরিয়াকে অপরূপা করে তুলেছে। পর্যটকদের আকর্ষণ করার মতো প্রকৃতির অকৃপণ এক উপহার রয়েছে এখানে। নদীর কলকল ধ্বনি,পাখির কলকাকলি,ঘন সবুজ বৃক্ষরাজি,অবারিত ফসলের মাঠ,সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের দৃশ্য দেখার মনোরম পরিবেশ, সব মিলিয়ে গজারিয়া যেন এক নান্দনিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। পৃথিবীর অন্যতম মেগাসিটি হিসেবে পরিচিত রাজধানী ঢাকা। অসহনীয় যানজট,জীবনজট আর মনুষ্য-ভিড়ের মধ্যে কোথাও কোন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার অবকাশ নেই। তাই অবসরে বিনোদনের জন্য মানুষ ছুটে আসছে গজারিয়ায়। এখানকার দর্শনীয় স্থানগুলো সহজে পর্যটকদের আকর্ষণ করে। মনের ভেতর ভালো লাগা তৈরি করে। নগরের যানজট-রুক্ষতার বিপরীতে মেঘনা,গোমতী,কাজলি আর ফুলদী নদীর সলিলস্পর্শে গজারিয়া সর্বদাই মায়াময়। ফুরফুরে বাতাসে নদীর পাড়ে ঢেউয়ের ছন্দময় শব্দ চাঁদের আলোয় ঝিকমিক নদীর জল,কূল ঘেঁষে যাওয়া নৌকায় লণ্ঠনের মৃদু আলো,মাঝির দরাজ গলায় ভাটিয়ালি গান শুনতে এই অঞ্চলের বিকল্প নেই।

মেঘনা ভিলেজ হলিডে রিসোর্ট

স্বল্প সময়ে বিনোদনের জন্য রয়েছে মেঘনা ভিলেজ রিসোর্ট। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কপথে মেঘনা সেতু পেরোলেই এক কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে বালুয়াকান্দি গ্রাম। ছায়াময় এই গ্রামের কোল ঘেঁষেই রিসোর্টটির অবস্থান। এখানে অবকাশ যাপনকারীদের জন্য রয়েছে থাকা-খাওয়া ও বিনোদনের সব ব্যবস্থা। এখানকার প্রতিটি ঘর একটু ভিন্নভাবে সাজনো, যা পর্যটকদের সহজেই আকর্ষণ করে। রিসোর্টের বিশাল মাঠে ইচ্ছে করলেই খেলাধুলায় মেতে ওঠা যায়।

রাতের বেলায় আরাম চেয়ারে বসে চাঁদনি দেখার ব্যবস্থাও রয়েছে এখানে। অর্থাৎ গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার চমৎকার ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। বিনোদন শেষে মাত্র ৫০ মিনিটের পথ পাড়ি দিয়ে ফিরে আসা যায় ব্যস্ত ঢাকায়। প্রাকৃতিক নৈসর্গিকতা উপভোগ করার জন্য মেঘনা ভিলেজ হলিডে রিসোর্টটি বিনোদনকারী অতিথিদের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

মাছ ধরার চাই তৈরির কুটির শিল্প

গজারিয়ার ঢাকা চট্টগ্রাম হাইওয়ের পাশে বালুয়াকান্দি ইউনিয়নে রয়েছে মাছ ধরার চাই তৈরির কুটির শিল্প। সবুজে ঘেরা ছায়াশীতল পরিবেশ, বিশাল আকারের মার্কেট ও বিভিন্ন আকষর্ণীয় মাছ ধরার সরঞ্জাম রয়েছে।

ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট

গজারিয়ার ঢাকা চট্টগ্রাম হাইওয়ের পাশে বাউশিয়া ইউনিয়নে প্রায় ৩ একর জায়গা নিয়ে অবস্থিত ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট। সবুজে ঘেরা ছায়াশীতল পরিবেশ, বিশাল আকারের পিকনিক স্পট ও বিভিন্ন আকর্ষণীয় বিশ্রামাগার রয়েছে।

শ্রী শ্রী চৈতন্য মন্দির

গজারিয়ার ঢাকা চট্টগ্রাম হাইওয়ের পাশে বাউশিয়া ইউনিয়নে প্রায় .৪০ একর জায়গা নিয়ে অবস্থিত শ্রী শ্রী চৈতন্য মন্দির। সবুজে ঘেরা ছায়াশীতল পরিবেশ, এটা গজারিয়ার অতি পুরাতন কীর্তি।

গজারিয়া জমিদার বাড়ি

গজারিয়া উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়নের গজারিয়া গ্রামে রয়েছে সবুজে ঘেরা ছায়াশীতল পরিবেশে ধনাঢ্য জমিদার লালমোহন সাহার দৃষ্টিনন্দন গজারিয়া জমিদার বাড়ি। গজারিয়ার হিন্দুদের মধ্যে তিনি ও তার পরিবার ছিলেন সবচেয়ে অভিজাত। বর্তমানে বিশাল এই জমিদার বাড়ীটি দু'টি মুসলিম পরিবারের দখলে। সুরম্য জমিদার বাড়ীর ভেতরের মূল প্রাসাদটি ইংরেজী এল আকৃতির। প্রাসাদের সামনে ছয়টি দরজা ও আটটি জানালা। এই প্রাসাদের ভেতর ও বাহিরে রয়েছে অপরূপ কারুকাজ। প্রাসাদটির দক্ষিণমুখে রয়েছে বিশাল তোরণ। তোরণের উপরে ৩টি মহিষের মাথা ও সিং অংকিত রয়েছে। তোরণের দুই পাশে দুটি সুদৃশ্য ঘর রয়েছে।

আশ্রাব্দী জামে মসজিদ

হোসেনদী বাজার রোড হোসেনদী ইউনিয়নে প্রায় .০৪ একর জমির উপর সবুজে ঘেরা ছায়াশীতল পরিবেশে শতাব্দীর পুরাতন ৩ গুম্বুজ ৬মিনার সম্বলিত এই মসজিদ। এই মসজিদটি গজারিয়ার ঐতিহ্য বহন করে আসছে।

ফ্লাইং বোট

অনেকেরই পাখির মতো আকাশে ওড়ার স্বপ্ন থাকে। কিন্তু সাধ ও সাধ্যের সমন্বয় না হওয়ায় স্বপ্ন কেবল স্বপ্নই থেকে যায়। গজারিয়ায় এলেই কেবল আকাশে ওড়ার স্বপ্ন সত্যি হতে পারে। গজারিয়া উপজেলার বালুয়াকান্দি গ্রামে মেঘনা ও কাজলি নদীতে ফ্লাইং বোট সেবা শরীফ'স অ্যাভিয়েশন নামের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। ২০১৪ সালের জুন মাসে এই সার্ভিস চালু হয়। তাদের এই সেবা দেশজুড়ে ব্যাপক জনপিয়তা পেয়েছে। এই ফ্লাইং বোট মেঘনা ও কাজলি নদী থেকে সরাসরি চলে যায় আকাশে। পাইলটসহ দুজন আকাশ ভ্রমন করা যায়। বোটটি ৭ হাজার ফুট উচ্চতায় উড়তে পারে। তবে নিরাপত্তার জন্য উচ্চতা ১ হাজার ৫ শত ফুটের মধ্যে রাখা হয়। আবহাওয়া স্বাভাবিক ও অনুকূলে থাকতে প্রতি শুক্র ও শনিবার দিনব্যাপী আকাশভ্রমন করা যায়। বাতাসের গতিবেগ ২৫ কিলোমিটারের নিচে উড্ডয়নের উপযোগী বলে বিবেচনা করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধে গজারিয়া

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি

একাত্তরের নয় মাস গজারিয়ার বিশাল ক্যানভাস ছিল রক্তমাখা। মে' মাসেই এখানে যুদ্ধের বীরগাঁথা আখ্যান গড়ে ওঠে। ৯ মে পাকিস্তানি বাহিনী গণহত্যা চালিয়ে রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়। পাকিস্তানি বর্বরতায় নিহত হয় তিন শতাধিক মানুষ। এটাই ছিল গজারিয়ার প্রথম হত্যাযজ্ঞের ঘটনা।

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে গজারিয়া ছিল ২ নম্বর সেক্টরের অধীন। ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা জুলাই মাসে নিজ এলাকায় আসতে থাকেন । তারা সংঘবদ্ধ হয়ে নানা রকম চোরাগুপ্তা হামলা চালাতে থাকেন। এই অভিযানে দাউদকান্দি, মতলব ও হোমনা এলাকার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যক্ষ সর্মথন পাওয়া যায়। ঢাকার মুক্তিযোদ্ধারাও এখানে নানা সময়ে যুদ্ধে অংশগ্রহন করেন। ১৪ আগষ্ট রাতে পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ভাটেরচর সেতু উড়িয়ে দেন। এটাই ছিল পাকিস্তানিদের বিপক্ষে স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের প্রথম প্রতিবাদী হামলা । এই হামলার পর হানাদার বাহিনী বেশ নড়েচড়ে ওঠে। ভারতে আসা যাওয়ার বিষয়ে গজারিয়ার মুক্তিযোদ্ধাদের একটি ভৌগলিক সুবিধা ছিল। ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা গজারিয়া থেকে খুব বেশি দূরে নয়। কাছাকাছি অবস্থানের কারনে খুব সহজে আসা-যাওয়া করা যেত। তার ওপর নদীবেষ্টিত প্রত্যন্ত জনপদ হিসেবে গজারিয়ার মুক্তিযোদ্ধাদের আরেকটা বাড়তি সুবিধা ছিল। কারন পাকিস্তানিরা ছিল নদীর কাছে অনেকটা অসহায়। নদীর কারনেই সহজে তাদের পরাস্ত করা সম্ভব হয়ে ওঠে।

গজারিয়ার পাশেই মতলবের বেলতলী এলাকা। দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে পাকবাহিনী এখানে আসার সাহস পেত না। ফলে বেলতলী বাজারের কাছে গজারিয়ার মুক্তিযোদ্ধাদের একটি অংশের গোপন আস্তানা গড়ে ওঠে। তারা দিনের বেলায় আক্রমন করে রাতের বেলায় গোপন আস্তানায় চলে যেতেন। অপর দিকে বর্তমান মেঘনা উপজেলার বাহরকোলা,লুটেরচর,রামপুরা বাজার এবং গজারিয়া উপজেলার মুদারকান্দি,রায়পুরা ও আড়ালিয়া গ্রামে মুক্তিবাহিনীর আরেকটি অংশের গোপন আস্তানা গড়ে ওঠে। গুয়াগাছিয়া ছাড়া প্রায় সব ইউনিয়নেই পাকবাহিনী কম বেশি হামলা চালায়। গুয়াগাছিয়ায় পারেনি, কারণ গুয়াগাছিয়া ছিল বিচ্ছিন্ন দ্বীপ।

প্রায় দুইশ মুক্তিযোদ্ধা ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসে যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। এর মধ্যে বিএলএফের ১৪ জন। এফএফের ১২০ জন আর বাকিরা ভিত্তি ফৌজের। একেবারে ঠিকঠাক করে বললে ১৮২ জন মুক্তিযোদ্ধা ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তবে ১৯৯৯ সালের ২১ মার্চ সাপ্তাহিক মুক্তিবার্তায় প্রকাশিত হয় ২৪৩ জন মুক্তিযোদ্ধার নাম। গজারিয়ার মুক্তিযোদ্ধারা নিজ এলাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় নানা ধরনের অভিযানে অংশ নেন। সেনাবাহিনী, ইপিআর ও পুলিশ বাহিনী থেকেও গজারিয়ার ছেলেরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। স্থানীয় পর্যায়েও কেউ কেউ যুদ্ধ করেন। সব মিলিয়ে বর্তমানে যে তালিকাটি তৈরী হয়েছে, তাতে মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫০ জনের মতো।

মূলত ৩ ডিসেম্বর থেকে গজারিয়ায় গেরিলাযুদ্ধ শুরু হয়। মুক্তিবাহিনীর চোরাগুপ্তা আক্রমনের কারনে পাকিস্তানি বাহিনী দিশেহারা হয়ে বেপরোয়াভাবে অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও হত্যাযজ্ঞ চালাতে থাকে। ১০ ডিসেম্বর সকালে গজারিয়া এলাকা পুরোপুরিভাবে শত্রুমুক্ত হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

কর্ম পরিকল্পনা

কর্মপরিকল্পনা

কর্ম-পরিকল্পনাটি প্রস্তুত করার পূর্বে উপজেলা পরিষদের সকল সদস্যের সমন্বয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অভিমত এবং সরকারী কর্মকর্তাদের (বিশেষ করে উপজেলা পরিষদে ন্যস্তকৃত) অভিজ্ঞতা ও বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে কর্ম- পরিকল্পনাটি প্রস্তুত করা হয়। কর্ম-পরিকল্পনাটি তৈরির উদ্দেশ্য, প্রত্যাশা, পরিকল্পনার রুপরেখা নিম্নরূপঃ

প্রত্যাশা

উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, অবকাঠামো উন্নয়ন, আধুনিক সেচ ব্যবস্থাপনা ও নিষ্কাশন সুযোগ সৃষ্টি, সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, কৃষি ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি অর্জন, উন্নত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য হ্রাস এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জণ।

বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের প্রায় এক চতুর্থাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে দিনযাপন করছে। জীবনের মৌলিক সুযোগ সুবিধায় এদের প্রবেশাধিকার সীমিত। গজারিয়া উপজেলার জনসাধারণের অবস্থাও সারা দেশের জনাসাধারণের অবস্থা হতে ভিন্নতর নয়। অত্র এলাকার জনগণের দারিদ্রতা হ্রাসকরণ মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রনয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গজারিয়া উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গজারিয়া উপজেলা পরিষদের নিজস্ব সম্পদ এবং সরকারী ও বেসরকারীভাবে বরাদ্ধকৃত অর্থ জনগণের চাহিদা অনুসারে এবং প্রাধিকারে ভিত্তিতে সমন্বিত উপায়ে ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করা। বার্ষিক পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমুহ নিম্নরূপঃ

- ❖ জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে গজারিয়া উপজেলা পরিষদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধি;
- ❖ সর্বস্তরের জনসাধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ইউনিয়নের পরিকল্পিত উন্নয়ন সাধন;
- ❖ আপামর জনগণের চাহিদা মোতাবেক সেবা সরবরাহ নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে উপজেলা পরিষদের অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করা;
- ❖ পরিকল্পিত সেবা ও সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে এলাকার সেচ ব্যবস্থাপনা, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, শস্য, প্রাণী সম্পদের উৎস ইত্যাদি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা;
- ❖ উন্নত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সুযোগ সৃজন এবং তা গ্রহণে এলাকার জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং
- ❖ প্রতিটি ইউনিয়নের মধ্যে আন্তঃ যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন ইউনিয়নের সাথে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

বার্ষিক পরিকল্পনা রূপরেখাঃ

জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন প্রকল্প	শিল্প ও বানিজ্য উদ্যোগ	অন্যান্য
জাতীয় দপ্তর ভিত্তিক প্রকল্প যা ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে বাস্তবায়নযোগ্য	উপজেলা পরিষদের নিজস্ব প্রকল্প	শিল্প ও বানিজ্য প্রকল্প	মাননীয় সংসদ সদস্যের অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্প
	ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব প্রকল্প	ব্যাংকিং/ঋণ কার্যক্রম	এনজিও'র প্রকল্প
ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রকল্প	জেলা পরিষদের নিজস্ব প্রকল্প		সিভিল সোসাইটি/কমিউনিটি অর্গানাইজেশন

পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া ও কৌশলঃ

পরিকল্পনা প্রনয়ন প্রক্রিয়ায় কয়েকটি ধাপ অনুসরণ কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করার মধ্য দিয়ে গজারিয়া উপজেলা প্রথম বারের মতো একটি বার্ষিক পরিকল্পনা বই প্রনয়ন করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রথমত:
বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে ওয়ার্ড সভা ও উম্মুক্ত বাজেট সভা এবং উপজেলা পর্যায়ে উম্মুক্ত বাজেট সভা ও কর্মশালা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পরিষদের সভার অনুমোদন সাপেক্ষে উপজেলা পরিষদ দক্ষ ও যোগ্য সরকারি ও বেসরকারী কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি পরিকল্পনা সমন্বয় কমিটি গঠন করেছে।

দ্বিতীয়ত:
পরিকল্পনা সমন্বয় কমিটিতে সম্পদের উৎস্য এবং অর্থ প্রবাহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে এ কমিটি পরিষদে ন্যস্ত বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটিসমূহের পরামর্শ নিয়ে একটি সম্পদ মানচিত্র তৈরি করেছে ; যা পরিষদের খসড়া সমন্বিত পরিকল্পনা এবং সম্ভাব্য বাজেট তৈরিতে সহায়তা করেছে।

তৃতীয়ত:
উপজেলা পরিষদ ষ্ট্যান্ডিং কমিটিতে সক্রিয় এবং সরকারী জনবলকে দায়িত্বশীল করে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে খাতভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও চাহিদা নিরুপন করা হয়েছে। অতঃপর পরিকল্পনা সমন্বয় কমিটি স্থায়ী কমিটির নিকট থেকে চাহিদা /প্রস্তাবনা সংগ্রহপূর্বক সেগুলো নিয়ে একটি সমন্বিত খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করেছে।

চতুর্থত:
পরিকল্পনা কমিটি বিস্তারিত আলোচনার জন্য খসড়া পরিকল্পনাটি পরিষদের বিশেষ সভায় উপস্থাপন করেছে। অতঃপর উপজেলা পরিষদ খসড়া পরিকল্পনাটি নিয়ে পুনরায় আলোচনা করার জন্য উপজেলা পরিষদের সদস্য, সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা এবং জনপ্রতিনিধিগণ তাঁদের মতামত জানিয়েছেন। সবশেষে উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনাটি চুড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করেছে।

সম্পদ ও এর উৎস
গজারিয়া উপজেলার উন্নয় প্রকল্প বাস্তবায়নে যে সকল উৎস হতে সম্পদ আহরণ করা হবে তা নিম্নরূপঃ

- ❖ উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন সহায়তা তহবিল
- ❖ উপজেলা পরিষদের রাজস্ব উদ্বৃত্ত
- ❖ উপজেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত বিভিন্ন বিভাগের কর্মসূচী/বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থ
- ❖ প্রাধিকারভুক্ত কোন প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় বেসরকারি অনুদান হতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা সৃষ্ট তহবিল
- ❖ কাবিখা ও কাবিটা
- ❖ দাতা সংস্থা
- ❖ বেসরকারি সংস্থা
- ❖ সমবায় সমিতি
- ❖ অন্যান্য

বার্ষিক পরিকল্পনার সীমাবদ্ধতা
উপজেলা পর্যায়ের প্রথম বার্ষিক পরিকল্পনা হিসেবে এ পরিকল্পনার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন সেক্টরের তথ্য ঘাটতি রয়েছে বিধায় সংশ্লিষ্ট সেক্টরের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা কষ্টকর। উপজেলা পর্যায়ে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কোন রূপরেখা না থাকার ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন বিভাগের তথ্য, সম্পদ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে বিলম্ব হয়েছে। এ কারণে পরিকল্পনা প্রণয়নে সময় বেশী ব্যয় হয়েছে।

কর্মপরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গি
গজারিয়া উপজেলা পরিষদকে একটি শক্তিশালী, কার্যকর, ক্ষুধা, দারিদ্রমুক্ত, কর্মমূখী এবং গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতামূলক উন্নয়নধর্মী মডেল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা।

উপজেলার আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনার বিবেচ্য অগ্রাধিকার
মেঘনা-গোমতী নদীবেষ্টিত গজারিয়া উপজেলা একটি বিকাশমান শিল্প এলাকা। কয়েকটি শাখা নদী ও অসংখ্য এ উপজেলায় জালেরমত ছড়িয়ে আছে। জেলার মূল ভূ-খন্ড হতে উপজেলাটি বিচ্ছিন্ন। কৃষি ও বর্তমানে কলকারখানায় চাকুরী এ অঞ্চলের মানুষের প্রধান পেশা। মৎস্য আহরণ, পশু পালন করে কেউ কেউ জীবিকা নির্বাহ করে। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা, প্রবাসে গমন ঢাকাসহ বিভিন্ন বড় বড় শহরে অনেকে চাকুরী করে থাকেন। ব্যাপক মাত্রায় অবৈধ ক্ষতিকর মৎস্য

আহরণ সরঞ্জামের ব্যবহার উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ ধ্বংসের প্রধান কারণ। ব্যাপক হারে শিল্পায়ন হওয়ায় পরিবেশ দূষণের প্রভাব দৃশ্যমান। অসংখ্য খাল-বিল থাকায় চলাচলে দূর্গমতা, শিক্ষার মানে অধোগতি, অবকাঠামোগত দূর্বলতা, শিক্ষা-ও ক্রীড়াঙ্গনে উৎসাহ উদ্দীপনা পৃষ্ঠপোষকতার অভাব এ অঞ্চলের অন্যতম সমস্যা।

ঐতিহাসিক সময় কাল হতেই এ অঞ্চলের মানুষ প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে আছে। অসাম্প্রদায়িকতা, শান্তি প্রিয়তা, বড়দের প্রতি আনুগত্য, সমঝোতামূলক মনোভাব এ অঞ্চলের মানুষের আভ্যন্তরীণ শক্তির উৎস। যোগযোগ, কৃষি, শিল্প, কুটির শিল্প ও অবকাঠামো উন্নয়নে যথাযথ পদক্ষেপ এ অঞ্চলের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে সহায়ক হবে বলে স্থানীয় বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন।

সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য প্রয়োজন সঠিক তথ্য-উপাত্ত ও স্থানীয় কৃষ্টি-কালচার, দূর্বলতা/সমস্যা, সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা। সংগৃহিত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ বাস্তব ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে অগ্রাধিকার ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তার সুষ্ঠু ধারবাহিক বাস্তবায়নই পরিকল্পনা প্রণয়নের মূল চ্যালেঞ্জ। পরিকল্পনার বাস্তব ও ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং সমকালীন সময়ে স্থানীয় প্রয়োজন ও উদ্ভুত পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিকল্পনার পরিবর্তন বাস্তবভিত্তিক উন্নয়নের পথনির্দেশ করবে।

গজারিয়া উপজেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ভৌগলিক অবস্থা, সংস্কৃতি, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় নিম্ন বর্ণিত প্রধান প্রধান সমস্যা বলে বিবেচনা করে এ বার্ষিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

- ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন যেমন: ব্রীজ, কালভাট মাটি ও ইটের সলিং রাস্তা নির্মান করে হাট বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ ইউনিয়ন ও উপজেলা সদরের সাথে যোগযোগ সুবিধা বৃদ্ধি।

- এ এলাকার জনসাধারণকে শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত করে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে শিক্ষার মান উন্নয়ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ।

- অপরিকল্পিত নগরায়ন ও অন্যান্য কার্যক্রম হতে কৃষিজ জমি রক্ষা এবং বর্তমানে এক ফসলি জমিকে তিন ফসলীতে রূপান্তরে উপায়ে চাষাবাদ করার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও সরবরাহকৃত কৃষি উপকরণ সামগ্রীর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করণ। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদ হতে কৃষি উপরকরণ সরবরাহ এবং সেচ সুবিধার উন্নয়ন।

- বেকার সমস্যা দূরীকরণে কারিগরি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা এবং উপজেলায় কর্মরত বিভিন্ন সরকারী দপ্তরগুলোতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর সমন্বয় সাধন ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা গ্রহণ।

- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসারে উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ, ঋণ প্রাপ্তি সহজীকরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় সাধন এবং উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার জন্য নিয়মিত উদ্যোক্তা সম্মেলন প্রয়োজন।

- সমবায় আন্দোলন জোরদার করার জন্য সমবায়ীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও উৎসাহিত করণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

- আইসিটি বিষয়ক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ জোরদার করার জন্য উপজেলা ডিজিটাল সেন্টার, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার ল্যাব ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সার্বিক সমন্বয় সাধন ও আধুনিক/যুযোপযোগী কারিকুলাম অনুযায়ী দক্ষ প্রশিক্ষক তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ।

- ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সু-নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্কাউটিং, গার্লস ইন স্কাউটিং, রোভার স্কাউটিং কার্যক্রম জোরদার করণে উৎসাহ প্রদান।

- প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা এবং দুর্যোগকালীন সময়ে তৎক্ষনাৎ সেবা পাওয়ার জন্য স্থানীয় সেবচ্ছাসেবী বাহিনী প্রস্তুত করার জন্য রেড ক্রিসেন্ট দল প্রস্তুতিতে উৎসাহ প্রদান, গ্রাম-পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্য ও স্থানীয় যুবক-যুবতীদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

- নারী নির্যাতন, বাল্য বিবাহ রোধ, ইভটিজিং, মাদক সেবন, ইত্যাদি প্রতিরোধ এবং এগুলোর সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে জনসচেতনা সৃষ্টি এবং সামাজিক জীবন মান উন্নয়নে কর্মমূখী ও সুষ্ঠু প্রতিযোগীতার পরিবেশ তৈরীতে জনসচেতনতামূলক সভার আয়োজন ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের বক্তা হিসাবে উপস্থাপন করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

- ❖ দেশীয় সংস্কৃতির প্রসার ও সুস্থ্য বিনোদনের লক্ষ্যে উপজেলা শিল্পকলা একাডেমীসহ অন্যান্য সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনকে উৎসাহ প্রদান ও যথাপোযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- ❖ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ, সার্বিক উপকারভোগী বাছাই, দ্বৈততা পরিহার করার জন্য জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা।
- ❖ গ্রামীণ জনপদে বিনোদনের জন্য প্রতিটি ইউনিয়নে শিশু পার্ক প্রতিষ্ঠা, নতুন নতুন পর্যটন কেন্দ্র সৃষ্টি।
- ❖ উপজেলার স্থানীয় জসনাধারণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে উপজেলা সদরে একটি হাসাপাতাল স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা। বিদ্যমান স্বাস্থ্য অবকাঠামো সংস্কার ও স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণে উপজেলা পরিষদ হতে প্রকল্প গ্রহণ।
- ❖ যাত্রীসেবা ও যানবাহন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে যাত্রি ছাউনি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

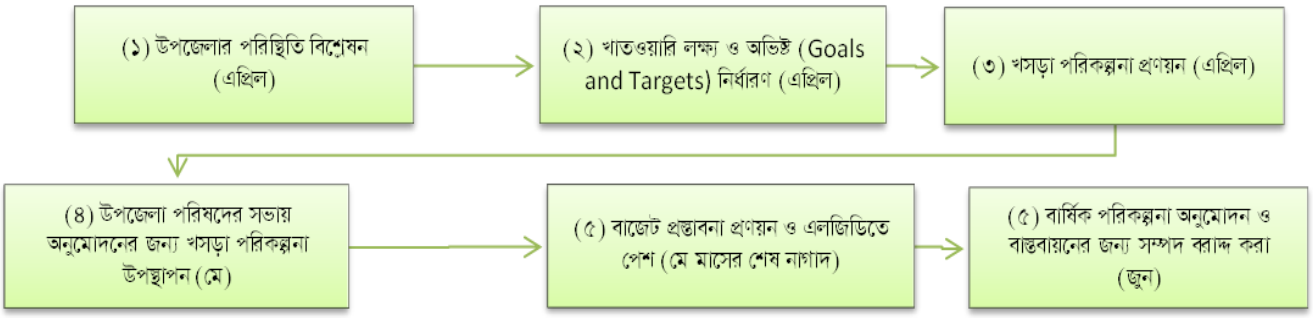

কমিটি সমূহঃ

গজারিয়া উপজেলা পরিষদ কর্তৃক গঠিত ১৭ (সতের) টি স্থায়ী কমিটি

আইন-শৃংখলা কমিটি

ক্রঃ নং-	সদস্যবৃন্দের নাম ও পদবী	কমিটির পদ মর্যাদা
১।	জনাব ফরিদা ইয়াছমিন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ	সভাপতি
২।	ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, গজারিয়া	সদস্য
৩।	ইউপি চেয়ারম্যান, গজারিয়া	সদস্য
৪।	ইউপি চেয়ারম্যান, টেঙ্গারচর	সদস্য
৫।	অফিসার ইনচার্জ গজারিয়া থানা	সদস্য-সচিব

কৃষি ও সেচ কমিটি

ক্রঃ নং-	সদস্যবৃন্দের নাম ও পদবী	কমিটির পদ মর্যাদা
১।	জনাব ফরিদা ইয়াছমিন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ	সভাপতি
২।	ইউপি চেয়ারম্যান, ভবেরচর	সদস্য
৩।	ইউপি চেয়ারম্যান, টেঙ্গারচর	সদস্য
৪।	ইউপি চেয়ারম্যান, ইমামপুর	সদস্য
৫।	উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, গজারিয়া মুন্সীগঞ্জ	সদস্য সচিব

যোগাযোগ ও ভৌতঅবকাঠামো উন্নয়ন কমিটি

ক্রঃ নং-	সদস্যবৃন্দের নাম ও পদবী	কমিটির পদ মর্যাদা
১।	জনাব ফরিদা ইয়াছমিন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ	সভাপতি
২।	ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, গজারিয়া	সদস্য
৩।	ইউপি চেয়ারম্যান, টেঙ্গারচর	সদস্য
৪।	ইউপি চেয়ারম্যান, গুয়াগাছিয়া	সদস্য
৫।	উপজেলা প্রকৌশলী (এলজিইডি)	সদস্য সচিব

মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা কমিটি

ক্রঃ নং-	সদস্যবৃন্দের নাম ও পদবী	কমিটির পদ মর্যাদা
১।	জনাব ফরিদা ইয়াছমিন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ	সভাপতি
২।	ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, গজারিয়া	সদস্য
৩।	ইউপি চেয়ারম্যান, ভবেরচর	সদস্য
৪।	ইউপি চেয়ারম্যান, হোসেন্দী	সদস্য
৫।	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য সচিব

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কমিটি

ক্রঃ নং-	সদস্যবৃন্দের নাম ও পদবী	কমিটির পদ মর্যাদা
১।	জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ	সভাপতি
২।	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, গজারিয়া	সদস্য
৩।	ইউপি চেয়ারম্যান, ইমামপুর	সদস্য
৪।	ইউপি চেয়ারম্যান, বালুয়াকান্দি	সদস্য
৫।	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য সচিব

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কমিটি

ক্রঃ নং-	সদস্যবৃন্দের নাম ও পদবী	কমিটির পদ মর্যাদা
১।	জনাব ফরিদা ইয়াছমিন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ	সভাপতি
২।	ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, গজারিয়া	সদস্য
৩।	ইউপি চেয়ারম্যান, টেঙ্গারচর	সদস্য
৪।	ইউপি চেয়ারম্যান, বাউশিয়া	সদস্য
৫।	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

যুব ও ক্রীড়া উন্নয়ন কমিটি

ক্রঃ নং-	সদস্যবৃন্দের নাম ও পদবী	কমিটির পদ মর্যাদা
১।	জনাব ফরিদা ইয়াছমিন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ	সভাপতি
২।	ইউপি চেয়ারম্যান, বালুয়াকান্দি	সদস্য
৩।	ইউপি চেয়ারম্যান, হোসেন্দী	সদস্য
৪।	ইউপি চেয়ারম্যান, ইমামপুর	সদস্য
৫।	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

সমাজ কল্যাণ কমিটি গঠন

ক্রঃ নং-	সদস্যবৃন্দের নাম ও পদবী	কমিটির পদ মর্যাদা
১।	জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ	সভাপতি
২।	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, গজারিয়া	সদস্য
৩।	ইউপি চেয়ারম্যান, গজারিয়া	সদস্য
৪।	ইউপি চেয়ারম্যান, ইমামপুর	সদস্য
৫।	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	সদস্য সচিব

মহিলা ও শিশু উন্নয়ন কমিটি গঠন

ক্রঃ নং-	সদস্যবৃন্দের নাম ও পদবী	কমিটির পদ মর্যাদা
১।	জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ	সভাপতি
২।	ইউপি চেয়ারম্যান, টেঙ্গারচর	সদস্য
৩।	ইউপি চেয়ারম্যান, হোসেন্দী	সদস্য
৪।	ইউপি চেয়ারম্যান, ভবেরচর	সদস্য
৫।	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

মুক্তিযোদ্ধা কমিটি গঠন

ক্রঃ নং-	সদস্যবৃন্দের নাম ও পদবী	কমিটির পদ মর্যাদা
১।	জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ	সভাপতি
২।	ইউপি চেয়ারম্যান, গজারিয়া	সদস্য
৩।	ইউপি চেয়ারম্যান, টেঙ্গারচর	সদস্য
৪।	ইউপি চেয়ারম্যান, গুয়াগাছিয়া	সদস্য
৫।	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ কমিটি গঠন

ক্রঃ নং-	সদস্যবৃন্দের নাম ও পদবী	কমিটির পদ মর্যাদা
১।	জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ	সভাপতি
২।	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ গজারিয়া	সদস্য
৩।	ইউপি চেয়ারম্যান, হোসেন্দী	সদস্য
৪।	ইউপি চেয়ারম্যান, টেঙ্গারচর	সদস্য
৫।	উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় কমিটি গঠন

ক্রঃ নং-	সদস্যবৃন্দের নাম ও পদবী	কমিটির পদ মর্যাদা
১।	জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ	সভাপতি
২।	ইউপি চেয়ারম্যান, টেঙ্গারচর	সদস্য
৩।	ইউপি চেয়ারম্যান, গজারিয়া	সদস্য
৪।	ইউপি চেয়ারম্যান, ভবেরচর	সদস্য
৫।	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

সাংস্কৃতিক কমিটি গঠন

ক্রঃ নং-	সদস্যবৃন্দের নাম ও পদবী	কমিটির পদ মর্যাদা
১।	জনাব ফরিদা ইয়াছমিন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ	সভাপতি
২।	ইউপি চেয়ারম্যান, টেঙ্গারচর	সদস্য
৩।	ইউপি চেয়ারম্যান, গুয়াগাছিয়া	সদস্য
৪।	ইউপি চেয়ারম্যান, হোসেন্দী	সদস্য
৫।	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য সচিব

বাজার মূল্য পর্যবেক্ষন, পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রন কমিটি গঠন

ক্রঃ নং-	সদস্যবৃন্দের নাম ও পদবী	কমিটির পদ মর্যাদা
১।	জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ	সভাপতি
২।	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, গজারিয়া	সদস্য
৩।	ইউপি চেয়ারম্যান, টেঙ্গারচর	সদস্য
৪।	ইউপি চেয়ারম্যান, ভবেরচর	সদস্য
৫।	উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

পরিবেশ ও বন কমিটি গঠন

ক্রঃ নং-	সদস্যবৃন্দের নাম ও পদবী	কমিটির পদ মর্যাদা
১।	জনাব ফরিদা ইয়াছমিন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ	সভাপতি
২।	ইউপি চেয়ারম্যান, গজারিয়া	সদস্য
৩।	ইউপি চেয়ারম্যান, হোসেন্দী	সদস্য
৪।	ইউপি চেয়ারম্যান, ভবেরচর	সদস্য
৫।	সহকারী বন সংরক্ষক	সদস্য সচিব

অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটি গঠন

ক্রঃ নং-	সদস্যবৃন্দের নাম ও পদবী	কমিটির পদ মর্যাদা
১।	জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ	সভাপতি
২।	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, গজারিয়া	সদস্য
৩।	ইউপি চেয়ারম্যান, টেঙ্গারচর	সদস্য
৪।	ইউপি চেয়ারম্যান, গুয়াগাছিয়া	সদস্য
৫।	উপজেলা হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কমিটি গঠন

ক্রঃ নং-	সদস্যবৃন্দের নাম ও পদবী	কমিটির পদ মর্যাদা
১।	জনাব ফরিদা ইয়াছমিন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ	সভাপতি
২।	ইউপি চেয়ারম্যান, গজারিয়া	সদস্য
৩।	ইউপি চেয়ারম্যান, গুয়াগাছিয়া	সদস্য
৪।	ইউপি চেয়ারম্যান, বালুয়াকান্দি	সদস্য
৫।	উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য) প্রকৌশল অধিদপ্তর	সদস্য সচিব

৪র্থ অধ্যায়

উপজেলা পরিষদের বাজেট

ফরম "ক"
(বিধি-৩ দ্রষ্টব্য)

বাজেট সার সংক্ষেপ

ক্রমিক নং	বিবরণ	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত	চলতি বছরের বাজেট বা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেট	পরবর্তী বছরের বাজেট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
অংশ-১	রাজস্ব হিসাব			
	প্রাপ্তি			
	রাজস্ব	৬,২৯,০১,১৯৭	৬,০৯,৮৫,০০০	৬,৩৭,৯০,০০০
	অনুদান	০০	০০	০০
	মোট প্রাপ্তি	৬,২৯,০১,১৯৭	৬,০৯,৮৫,০০০	৬,৩৭,৯০,০০০
	বাদ রাজস্ব ব্যয়	৪,১৮,২৯,২৯৩	৫,৯৩,৭৪,০০০	৫,৮৬,৬৯,০০০
	রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি (ক)	২,১০,৭১,৯০৪	১৬,১১,০০০	৫১,১২,০০০
অংশ-২	উন্নয়ন হিসাব	৪,৮০,৬৬,৯৭১	৬,৮৯,৮৪,৪৩৫	৭,৫০,০০,০০০
	উন্নয়ন অনুদান	০০	০০	০০
	অন্যান্য অনুদান ও চাঁদা	০০	০০	০০
	মোট (খ)	৪,৮০,৬৬,৯৭১	৬,৮৯,৮৪,৪৩৫	৭,৫০,০০,০০০
	মোট প্রাপ্ত সম্পদ (ক+খ)	৬,৯১,৩৮,৮৭৫	৭,০৫,৯৫,৪৩৫	৮,০১,১২,০০০
	বাদ উন্নয়ন ব্যয়	৫,৮৯,০০,০০০	৬,৮৯,৮৪,৪৩৫	৬,৯৯,০০,০০০
	সার্বিক বাজেট উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি	১,০২,৩৮,৮৭৫	১৬,১১,০০০	১,০২,১২,০০০
	যোগ প্রারম্ভিক জের (১ লা জুলাই)			
	সমাপ্তি জের			

ফরম-খ

(বিধি-৩ এবং আইনের চতুর্থ তপছিল দ্রষ্টব্য)

অর্থ বছর ২০১৮-২০১৯
রাজস্ব হিসাব
প্রাপ্ত আয়

অংশ-০১

প্রাপ্তির বিবরণ	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৭-২০১৮)	চলতি বছরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৮-২০১৯)	পরবর্তী বছরের বাজেট (২০১৯-২০২০)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
০১. হাট- বাজার ইজারা	৩৩,২৯,৮১৫	৩৪,০০,০০০	৩৫,০০,০০০
০২. বাসাভাড়া ও অন্যান্য	৩,৮৪,৪১১	৩,৮৫,০০০	৩,৯০,০০০
০৩. লাইসেন্স প্রদান	০০	০০	০০
০৪. ভূমি উন্নয়ন কর	২,২০,০০,০০০	২,২২,০০,০০০	২,২৪,০০,০০০
০৫. বিবিধ (রাজস্ব উদ্বৃত্ত)	৩,৭১,৮৬,৯৭১	৩,৫০,০০,০০০	৩,৭৫,০০,০০০
মোট	৬,২৯,০১,১৯৭	৬,০৯,৮৫,০০০	৬,৩৭,৯০,০০০

অংশ-০১- রাজস্ব হিসাব

ব্যয়

ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৭-২০১৮)	চলতি বছরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৮-২০১৯)	পরবর্তী বছরের বাজেট (২০১৯-২০২০)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
০১	সাধারণ সংস্থাপন/ প্রাতিষ্ঠানিক	০০	০০	০০
	ক. সম্মানী ভাতা	১১২৮০০০	১১২৮০০০	১১২৮০০০
	খ. কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা	০০	০০	০০
	(১) পরিষদ কর্মচারী (মালি) মজুরী বাবদ	৯০০০০	৩২৪০০০	৩২৪০০০
	(২) দায়যুক্ত ব্যয় (সরকারী কর্মচারী সম্পর্কিত)	০০	০০	০০
	গ. অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়	৫০০০০	৫০০০০	৫০০০০
	ঘ. আনুতোষিক তহবিলের স্থানান্তর	০০	০০	০০
	ঙ. যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী	৫০০০০	৫০০০০	৫০০০০
০২	কর আদায়ের জন্য ব্যয়	০০	০০	০০
০৩	অন্যান্য ব্যয়	০০	০০	০০
	ক. টেলিফোন	৪০০০	৪০০০	৪০০০
	খ. বিদ্যুৎ বিল	৩৩০০০০	৪০০০০০	৪৫০০০০
	গ. পৌরকর	০০	০০	০০
	ঘ. গ্যাস বিল	০০	০০	০০
	ঙ. পানির বিল	০০	০০	০০
	চ. ভূমি উন্নয়ন কর	০০	০০	০০
	ছ. অভ্যন্তরিন অডিট ব্যয়	০০	০০	০০
	জ. মামলা খরচ	০০	১০০০০০	১২০০০০
	ঝ. আপ্যায়ন ব্যয়	২৪০০০০	২৪০০০০	২৪০০০০
	ঞ. রক্ষণাবেক্ষন এবং সার্ভিসের জন্য ব্যয়	০০	৫০০০০	৫০০০০
	ট. অন্যান্য পরিশোধযোগ্য কর / বিল	০০	৫০০০০	৫০০০০
	ঠ. আনুষাঙ্গিক ব্যয়	৪৮০০০	৪৮০০০	৪৮০০০
০৪	কর আদায় খরচ (বিভিন রেজিস্টার, ফরম, রশিদ বই,ইত্যাদি মূদ্রণ)	০০	০০	০০
০৫	বৃক্ষরোপন ও রক্ষণাবেক্ষন	০০	৫০০০০০	৫৫০০০০
০৬	সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান	০০	০০	০০
	ক. উপজেলা এলাকার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ ক্লাব আর্থিক অনুদুান	০০	৫০০০০০	৫৫০০০০
০৭	জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন	১০০০০০	১০০০০০	১০০০০০
০৮	খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক/ স্কাউটস্	৩০০০০	৩০০০০০	৩০০০০০
০৯	জরুরী ত্রাণ	০০	১৫০০০০০	১৫০০০০০
১০	আনসারদের ভাতা	১৫০০০০	২০০০০০	২৫০০০০
১১	উন্নয়ন মেলার ব্যয়	১০০০০০	১০০০০০	১০০০০০
১২	ভবন মেরামত / সংরক্ষণ	৭০০০০০	৭০০০০০	৭০০০০০
১৩	পানির পাম্প মেরামত	১০০০০০	১৫০০০০	১৮০০০০
১৪	ভ্রমন ভাতা বাবদ ব্যয়	১২০০০০	১২০০০০	১২০০০০
১৫	বাড়ী ভাড়া (চেয়ারম্যান)	৬০০০০	৬০০০০	৬০০০০
১৬	বিজ্ঞাপন বিল ব্যয়	৪৪২৩২২	৫০০০০০	৫২৫০০০
১৭	অপ্রত্যাশিত ব্যয়	৫০০০০০	৫০০০০০	৫০০০০০
১৮	উপজেলা পরিষদের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	০০	১৬০০০০০০	১০০০০০০০
১৯	শিক্ষাবৃত্তি প্রদান বাবদ	৪০০০০০	৪০০০০০	৪০০০০০
২০	প্রকাশনা বাবদ খরচ	০০	৩০০০০০	৩২০০০০
২১	রাজস্ব উদ্বৃত্ত উন্নয়ন হিসেবে স্থানান্তর	৩৭১৮৬৯৭১	৩৫০০০০০০	৪০০০০০০০
	মোট	৪১৮২৯২৯৩	৫৯৩২৪০০০	৫৮৬১৪০০০

অংশ-২- **উন্নয়ন হিসাব**

প্রাপ্তি

আয়			
প্রাপ্তির বিবরণ	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৭-২০১৮	চলতি বছরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৮-২০১৯)	পরবর্তী বছরের বাজেট (২০১৯-২০২০)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
০১. অনুদান (উন্নয়ন)	০০	০০	০০
(ক) সরকার	১০৮৮০০০০	১১০০০০০০	১২০০০০০০
(খ) অন্যান্য উৎস(যদি থাকে) নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে	০০	০০	০০
০২. স্বেচ্ছা প্রনোদিত	০০	০০	০০
০৩. রাজস্ব উদ্বৃত্ত	৩৭১৮৬৯৭১	৩৫০০০০০০	৪০০০০০০০
০৪. উন্নয়ন উদ্বৃত্ত	০০	২২৯৮৪৪৩৫	২৩০০০০০০
মোট প্রাপ্তি (উন্নয়ন হিসাব)	৪৮০৬৬৯৭১	৬৮৯৮৪৪৩৫	৭৫০০০০০০

অংশ-২- **উন্নয়ন হিসাব**

ব্যয়

ব্যয়			
ব্যয় বিবরণী	পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (২০১৭-২০১৮)	চলতি বছরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট (২০১৮-২০১৯)	পরবর্তী বছরের বাজেট (২০১৯-২০২০)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
০১. কৃষি ও ক্ষুদ্র সেচ ঃ			
ক. কৃষি ও সেচ	৮০০০০০	১৫০০০০০	১৬০০০০০
খ. মৎস্য ও প্রানিসম্পদ	২০০০০০০	২৫৫০০০০০	২৮৫০০০০
গ. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	৬০০০০০	৬০০০০০	২২৫০০০০
০২. বস্তুগত অবকাঠামো ঃ			
ক. পরিবহন ও যোগাযোগ	৩০০০০০০০	৩০০০০০০০	৩১০০০০০০
খ. জনস্বাস্থ্য	২০০০০০০	৩০০০০০০	৩০৫০০০০
০৩. আর্থ সামাজিক অবকাঠামো ঃ			
ক. শিক্ষার উন্নয়ন	১০০০০০০০	১১২৫০০০০	১২০৫০০০০
খ. স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ	৩০০০০০০	৫৩০০০০০	৫৪০০০০০
গ. যুব ক্রীড়া ও সংস্কৃতি	৪৫০০০০০	৩৭০০০০০	৩৩৫০০০০
ঘ. মহিলা ও শিশু কল্যাণ	৫০০০০০০	৪০০০০০০	৫০৫০০০০
ঙ. বিবিধ (প্রয়োজনে অন্যান্য খাতে এইরুপ ব্যয় উল্লেখ করিতে হইবে)	১০০০০০০	৭০৮৪৪৩৫	৩৩০০০০০
৪. সমাপ্তির জের			
মোট ব্যয় উন্নয়ন হিসাব	৫৮৯০০০০০	৬৮৯৮৪৪৩৫	৬৯৯০০০০০

৫ম অধ্যায়

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ :

খাত	সমস্যাসমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক, চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী	১ বছর পর পরিস্থিতির বিবরণ	সুযোগ/ ঝুঁকি
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	কারণ			
শিক্ষা	৪ টি ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের জরাজীর্ণ অবকাঠামো ও অন্যান্য অসুবিধা	বাউশিয়া, ভবেরচর, টেংগারচর ও হোসেন্দী ইউনিয়নে	প্রায় ৩০০০ শিক্ষার্থী সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ	সুবিধাদির ব্যবস্থাপনার অভাব	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা উপকরন, উচু নিচু বেঞ্চ, টিফিন বক্স, স্কুল ব্যাগ বিতরণ ও সিলিং ফ্যান সরবরাহ, সোলার স্থাপন, শ্রেণী কক্ষ স্থাপন ও যাতায়তের জন্য রাস্তা পুনঃ নির্মাণ	১ বছর পরে পরিস্থিতির ৬৫% ভাগ উন্নতি হবে এবং ৩০০০ শিক্ষার্থী সরাসরি উপকৃত হবে।	উপজেলা পরিষদকে অবশিষ্ট কাজের উদ্যোগ নিতে হবে এবং সম্পাদিত কাজের রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা করতে হবে।
যোগাযোগ	উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বাজারজাতকরন জরুরী যোগাযোগ ও সাধারনের স্বাভাবিক যাতায়াতে অসুবিধা	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী বাজারজাত করনে দীর্ঘ সময় ও অধিক অর্থ অপচয় হচ্ছে, জরুরী যোগাযোগ ও স্বাভাবিক যাতায়াতে জনসাধারণকে প্রতিনিয়ত কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে।	অভ্যন্তরিন যোগাযোগের ক্ষেত্রে জড়াজীর্ণ রাস্তাঘাট, অতিবৃষ্টির কারনে অনেক রাস্তাঘাট ভেঙ্গে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।	বাউশিয়া, ভবেরচর, টেংগারচর, বালুয়াকান্দি ও ইমামপুরের রাস্তাঘাট নতুন/ সংস্কার/ইট সলিং করে সাধারণের চলাচলের সুবন্দোবস্ত করে দেয়া হবে।	উপজেলার ৮টি ইউনিয়নের অভ্যন্তরিন যোগাযোগ ব্যবস্থার ৪০% সমস্যার সমাধান হলে এর মাধ্যমে এলাকার সাধারণ মানুষ যথাযথ যোগাযোগ সুবিধা পাবে।	উপজেলা পরিষদকে সম্পাদিত উন্নয়ন কর্মসূচীর সঠিক রক্ষনাবেক্ষনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য অবশিষ্ট কর্মসূচীর জন্য পর্যায়ক্রমে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

স্যানিটেশন	উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে স্যানিটেশন ব্যবস্থা সন্তোষজন নয়	উপজেলার বাউশিয়া **ভবেরচর** টেংগারচর বালুয়াকান্দি ইমামপুর ও হোসেন্দী ইউনিয়নে	স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন ও যথাযথ ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় জলাবদ্ধতার কারনে প্রতি বছর বিশেষ করে দরিদ্র-অতিদরিদ্র পরিবার সমুহের নারী-শিশুসহ অনেক মানুষ পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।	পানি নিস্কাশনের জন্য যথাযথ ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকা এবং দরিদ্র পরিবার সমুহ স্যানেটরী ল্যাট্রিন ব্যবহার না করা।	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন সমূহে মোট ৮০০ টি পরিবারে স্যানেটারী ল্যাট্রিন প্রদান ও ড্রেন নির্মাণ করে স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হবে।	৮০০ টি পরিবার স্যানেটারী ল্যাট্রিন ব্যবহারের মাধ্যমে উপজেলার ৮টি ইউনিয়নে শতভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিত হবে এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করনের ফলে ৮টি ইউনিয়নের ৫০ % জলাবদ্ধতা দূর করা সম্ভব হবে।	উপজেলা পরিষদকে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পরিবার সমূহের স্যানেটারী ল্যাট্রিন ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও নির্মিত ড্রেন সমূহের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।
আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন	আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহনের সুযোগের স্বল্পতা	উপজেলার ৮টি ইউনিয়নে	আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহনের সুযোগের স্বল্পতার কারণে দরিদ্র-অতিদরিদ্র পরিবারসমূহ অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়ছে।	অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ স্বল্পতা ও তাদের অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা	উপজেলার ৮টি ইউনিয়নের দরিদ্র-অতিদরিদ্র পরিবারের ২০০ নারীকে ০৩ মাসের বুনিয়াদী সেলাই প্রশিক্ষণ শেষে সেলাই মেশিন সরবরাহ ও আর্থিক সুবিধা প্রদান করে তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করে পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখা হবে।	২০০ টি পরিবারের নারীগণ প্রশিক্ষণ গ্রহনের মাধ্যমে দক্ষ হয়ে পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার মান উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।	উপজেলা পরিষদকে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে প্রশিক্ষণে গুনগতমান নিশ্চিত করনসহ পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট পরিবার সমূহকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

রূপকল্প বিবরণী

রূপকল্প বিবরণী

কর্ম-পরিকল্পনা

কর্ম-পরিকল্পনাটি প্রস্তুত করার পূর্বে উপজেলা পরিষদের সকল সদস্যের সমন্বয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অভিমত এবং সরকারী কর্মকর্তাদের (বিশেষ করে উপজেলা পরিষদে ন্যস্তকৃত) অভিজ্ঞতা ও বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে কর্ম- পরিকল্পনাটি প্রস্তুত করা হয়। কর্ম-পরিকল্পনাটি তৈরির উদ্দেশ্য, প্রত্যাশা, পরিকল্পনার রুপরেখা নিম্নরূপঃ

প্রত্যাশা

উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, অবকাঠামো উন্নয়ন, আধুনিক সেচ ব্যবস্থাপনা ও নিষ্কাশন সুযোগ সৃষ্টি, সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, কৃষি ক্ষেত্রে সমৃদ্ধি অর্জন, উন্নত শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য হ্রাস এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জণ।

বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের প্রায় এক চতুর্থাংশ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে দিনযাপন করছে। জীবনের মৌলিক সুযোগ সুবিধায় এদের প্রবেশাধিকার সীমিত। গজারিয়া উপজেলার জনসাধারণের অবস্থাও সারা দেশের জনাসাধারণের অবস্থা হতে ভিন্নতর নয়। অত্র এলাকার জনগণের দারিদ্রতা হ্রাসকরণ মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রনয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গজারিয়া উপজেলা পরিষদের বার্ষিক পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে গজারিয়া উপজেলা পরিষদের নিজস্ব সম্পদ এবং সরকারী ও বেসরকারীভাবে বরাদ্ধকৃত অর্থ জনগণের চাহিদা অনুসারে এবং প্রাধিকারে ভিত্তিতে সমন্বিত উপায়ে ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করা। বার্ষিক পরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমুহ নিম্নরূপঃ

- জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে গজারিয়া উপজেলা পরিষদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধি;
- সর্বস্তরের জনসাধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ইউনিয়নের পরিকল্পিত উন্নয়ন সাধন;
- আপামর জনগণের চাহিদা মোতাবেক সেবা সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে উপজেলা পরিষদের অংশীদারিত্ব সৃষ্টি করা;
- পরিকল্পিত সেবা ও সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে এলাকার সেচ ব্যবস্থাপনা, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, শস্য, প্রাণী সম্পদের উৎস ইত্যাদি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা;
- উন্নত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সুযোগ সৃজন এবং তা গ্রহণে এলাকার জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং
- প্রতিটি ইউনিয়নের মধ্যে আন্তঃ যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন ইউনিয়নের সাথে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

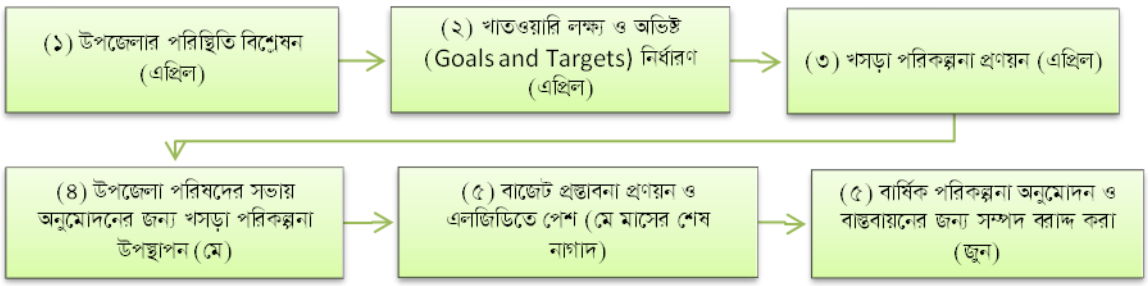

৭ম অধ্যায়

বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা ও ফলাফল

বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা ও ফলাফলঃ

(AP Sector Goals and Outcomes)

নং	বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য(AP Goals)	খাত (Sector)	উদ্দেশ্য (Objectives)	বার্ষিক পরিমাপযোগ্য অভিষ্ট (Annual measurable targets)
১	শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয় ভবন/ শ্রেণি কক্ষ নির্মাণ/ যাতায়াতের জন্য রাস্তা পূনঃ নির্মাণসহ অন্যান্য সুবিধাদির উন্নয়নের মাধ্যমে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা।	শিক্ষা	অতিরিক্ত শিক্ষার্থীদের ধারন করার জন্য নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ	• হোসেন্দী ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে ২৫০ শিক্ষার্থীর জন্য ৫ টি শ্রেণি কক্ষ সম্বলিত একটি স্কুল ভবন নির্মাণ করা হবে।
			শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়গামী করা ও বিদ্যালয়ে পাঠদানের জন্য শিক্ষা উপকরণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ	• হোসেন্দী ইউনিয়নের হোসেন্দী হাফিজিয়া মাদ্রাসা-১টি, চরচৌদ্দ কাহনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে-১টি ও চর বাউশিয়া বড় কান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ০২টি সোলার স্থাপন করা হবে। • শ্রীনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরজা/জানালা সংস্কার ও ৩০০সেট করে আসবাবপত্র সরবরাহ ও টিফিন বক্স বিতরণ করা হবে • পোড়াচক বাউশিয়া পূর্ব নয়াকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা উপকরণ ও সিলিং ফ্যান বিতরণ করা হবে। • চর বাউশিয়া বড় কান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উচু নিচু বেঞ্চ প্রদান ও দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষা উপকরন বিতরণ করা হবে;
			বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের নিরাপদে যাতায়াতের জন্য রাস্তা পুনঃ নির্মাণ	• জামালদী নিউ সানরাইজ কিন্টারগার্ডেন সংলগ্ন এস, ডি খান সড়ক হতে নদীর পাড় পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং ১০কিঃ মিঃ রাস্তা পুন:নির্মাণ করা হবে।
২	পুরাতন রাস্তা মেরামত/সংস্কার, মাটির রাস্তা নির্মাণ ও ইটের সলিং/ঢালাই রাস্তা নির্মাণ করে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের অভ্যান্তরিন যোগাযোগ ব্যবস্থার মান উন্নয়ন করা।	যোগাযোগ	পাকা ঘাটলা নির্মাণ	• পাড়াচক বাউশিয়া পূর্ব নয়াকান্দি ওমর আলীর বাড়ির সামনে পাকা ঘাটলা নির্মাণ • পশ্চিম নয়াকান্দি ফারুকের বাড়ির সামনে পাকা ঘাটলা নির্মাণ • **পৈক্ষারপার নতুন রাস্তার মাথায় পাকা ঘাটলা নির্মাণ**
			ইটের সলিং/ঢলাই রাস্তা র্নিমাণ/ গাইড ওয়াল	• পশ্চিম নয়াকান্দি কবরস্থান হতে কাশেমের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইট বিছানো • পুরান বাউশিয়া হযরত আলীর বাড়ি হতে ধন মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইট বিছানো • ভিটিকান্দি আবুবকরের বাড়ী হতে নদীর পার পর্যন্ত রাস্তা এইচ বি বি করণ • ইসমানিরচর আলী হোসেনের বাড়ি হতে জেলে পাড়া পর্যন্ত রাস্তা রক্ষার্থে গাইড ওয়াল নির্মাণ। • ভবানীপুর নজরুল চেয়ারম্যানের বাড়ি হতে বোরহান মোল্লার জমি পর্যন্ত গ্রাম রক্ষার্থে গাইড ওয়াল নির্মাণ।

৩	৮০০ টি পরিবার স্যানেটারী ল্যাট্রিন ব্যবহারের মাধ্যমে উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে শতভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিত করা এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করনের ম্যাধ্যমে ৬টি ইউনিয়নের ৫০% জলাবদ্ধতা দূর করণ।	স্যানিটেশন	এলাকার দরিদ্র-অতিদরিদ্র পরিবারসমূহকে স্বাস্থ্য সম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার নিশ্চিত করনের আওতায় আনার জন্য স্যানেটারী ল্যাট্রিন বিতরণ	• ২০১৮-১৯ অথ-বছরের বাউশিয়া, ভবেরচর, টেংগারচ, বালুয়াকান্দি ও ইমামপুর ইউনিয়নের দরিদ্র-অতিদরিদ্র ৬০০ টি পরিবারে মধ্যে ৬০০ সেট স্যানেটারী ল্যাট্রিন বিতরণ/ স্থাপন করা হবে।
			সাধারন জনগনের জন্য পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	• ভবেরচর ইউনিয়নের ভবেরচর বাস স্টান্ডে ০১টি পাবলিক টয়লেট ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নির্মাণ করা হবে।
			এলাকার জলাবদ্ধতা দূর করার জন্য রাস্তার পার্শ্বে ড্রেন নির্মাণ	• ২০১৮-১৯ অর্থ-বছরে টেংগারচর ইউনিয়নের উত্তরশাহপুর পাকা রাস্তা হতে উত্তরশাহপুর জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তার পার্শ্বে ড্রেন নির্মাণ করা হবে। • ভাষারচর ব্রীজ হতে কুঁড়ের ঘাট পর্যন্ত রাস্তায় ড্রেন নির্মাণ করা হবে। • নতুন চরচাষী ওমর আলীর বাড়ী হতে নুরু মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ড্রেন নির্মাণ।
৪	২০০ টি দরিদ্র পরিবারের নারীকে ০৩ মাসের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার মান উন্নয়নে অবদান রাখর সুযোগ সৃষ্টি করা।	নারী উন্নয়ন	দরিদ্র পরিবারের নারীদের জন্য ০৩ মাসের সেলাই প্রশিক্ষনের আয়োজন করা	• বাউশিয়া, ভবেরচর, টেংগারচর, বালুয়াকান্দি ও ইমামপুর ইউনিয়নের ২০০ জন নারীকে ০৩ মাসের বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান এর মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা হবে।
			দরিদ্র পরিবারের নারীদের আয়বর্ধ্বন মূলক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য সেলাই মেশিন ও আর্থিক অনুদান প্রদান করা	• বাউশিয়া, ভবেরচর, টেংগারচর, বালুয়াকান্দি ও ইমামপুর ইউনিয়নের ২০০ জন দরিদ্র পরিবারের নারীকে প্রশিক্ষণ পরবর্তী আয়বর্ধ্বন মূলক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য সেলাই মেশিন ও আর্থিক অনুদান প্রদান করে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হবে।

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বিভিন্ন খাতের উন্নয়নভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি

উপজেলার আর্থ সামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে রুপকল্প ২০২১ অর্জনের লক্ষ্যে উপজেলায় কর্মরত সরকারি দপ্তরগুলোর আগামী ৫ বছরের উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি কি হওয়া প্রয়োজন এ নিয়ে কর্মকর্তাগণ স্ব-স্ব বিভাগে আলোচনা করার পর প্রকাশনা কমিটিতে পর্যালোচনা করা হয়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির পরামর্শ গ্রহন করা হয়। দপ্তরভিত্তিক আগামী ৫ বছরের উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নরুপঃ

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যলয়

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় জাতীয় সরকারের অগ্রাধিকারমূলক বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের পাশাপাশি সার্বিক আইন-শৃংখলা রক্ষা, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন দপ্তরগুলোর মধ্যে সমন্বয় করে থাকে। উপজেলা পরিষদকে এ অফিস হতে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা হয়। উপজেলা সার্বিক উন্নয়নে এ কার্যালয়ের ব্যপক ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে। গজারিয়া উপজেলার প্রধান প্রধান সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানে আগামী একঁ বছরে নিম্মোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা যায়।

ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে ক্লাস নেয়া, আইসিটি শিক্ষার প্রসার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা ও উন্নত পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে শিক্ষার মান নিশ্চিত করা, ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণকারী সরকারি/বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক, প্রশিক্ষণ প্রদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সাথে সমন্বয় করে উদ্দ্যোক্তা তৈরির প্রয়াস গ্রহন করা। সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে মাদকমুক্ত, বাল্যবিবাহমুক্ত, যৌন হয়রানি মুক্ত নারী বান্ধব উপজেলা প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্বক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করা ও সরকারি

সহায়তার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে কৃষি জমি গুলো ত্রি-ফলা করে উপজেলাকে অর্থনীতির মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা। জাতীয় সরকার, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী, এনজিও এবং উপজেলার বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারী অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসাবে কাজ করে উপজেলার সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা করা।

উপজেলা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

বর্তমানে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের প্রধান মূল সমস্যা হলো গজারিয়া উপজেলার কমিউনিটি ক্লিনিক ভবন গুলোর ভগ্নদশা। ভৌত অবস্থার উন্নয়নের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টা অব্যহত আছে। সেবার মান বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সময় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট বিভাগের একটি চলমান কার্যক্রম, সেখানে আরও দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন আছে। আগামী ১ (এক) বছরের মধ্যে সেবার মান উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য সেবা জনগনের দোড় গোড়ায় পৌছানো। এ ছাড়া উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, কমিউনিটি গ্রুপ, কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপ সদস্যগণের এবং কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবার মান বৃদ্ধি করা।

উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

বর্তমানে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের প্রধান ও মূল সমস্যা হল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের ভবন গুলোর জরাজীর্ণ অবস্থা। অধিকাংশ ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে এস, এস, এমও পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকাদের বসবাসের জন্য উপযুক্ত বাসভবন ও পানির ব্যবস্থা নেই। আগামী এক বছরের মধ্যে ভৌত অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। বিশেষ করে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়ের জন্য আলাদা নিজস্ব ভবন তৈরির প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এছাড়া সেবার মান বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সময় মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য আরও দৃষ্টি দেয়া হবে। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি বিদ্যমান ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে সর্বাত্বক সহায়তা করবে।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

বর্তমানে অত্র উপজেলায় দুই ফসলী জমি বেশী তাই ফসলী জমিকে দুই ফসলী জমি, দুই ফসলী জমিকে তিন ফসলী জমি এবং তিন ফসলী জমিকে বহু ফসলী জমিতে রুপান্তর করা। কৃষিকাজে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি যেমন-পাওয়ার ট্রিলার, রাইস ট্রান্সপ্ল্যান্টার ইত্যাদি ব্যবহার করা, আইসিএম পদ্ধতিতে পোকা দমনে ১০০% জমিতে পার্চিং করা, আধুনিক কৃষিতে ড্রাম সিডার, এলসিসি ব্যবহার করা, গুড়া ইউরিয়ার পরিবর্তে গুটি ইউরিয়া ব্যবহার করা, সুষম সার ব্যবহার করা। অত্র উপজেলায় বোরো আবাদ কম হওয়ায় পতিত জমিতে গম, ভূট্টা ও ডাল জাতীয় ফসলের আওতায় অধিক জমি আনা। সর্বোপরি কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে গড়ে তোলা ও কৃষির সাথে সম্পৃক্ত সকল কমিটির কার্যক্রম জোরদার করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকান্ডকে বেগবান করা।

উপজেলা মৎস্য অধিদপ্তর

গজারিয়া সদর উপজেলার মৎস্য দপ্তর-এর মৎস্য চাষ বৃদ্ধি ও উৎপাদনমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী ১ বছরে (২০১৮-১৯) সম্ভাব্য প্রায় ৫৬৭৫.০ মে. টন মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি হবে এবং এর ফলে এলাকাস্থ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে জাটকা সংরক্ষণ, প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ সংরক্ষণ, অবৈধ কারেন্ট জাল উচ্ছেদ সহ জাটকা আহরণে বিরত থাকা জেলেদের পুর্নবার্সন এবং বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি বড় চ্যালেঞ্জ। ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনায় বাস্তবমূখী পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি করে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা। এছাড়া স্থানীয় মৎস্য চাষীদের মাছ চাষের উন্নত আধুনিক প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন সর্বোপরি জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের মাধ্যমে রুপকল্প ২০২১ এর লক্ষ্য অর্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখা।

উপজেলা প্রানি সম্পদ অধিদপ্তর

প্রাণী সম্পদ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তথা প্রাণীজ আমিষ পূরনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এ প্রেক্ষপটে উপজেলা প্রাণি সম্পদ দপ্তর আগামী এক বছরের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে চলছে। এর উদ্দেশ্য হল প্রাণিজ আমিষ যেমন মাংস, দুধ, ডিমজাত খাদ্য উৎপাদন করে উপজেলার মানুষের চাহিদা পূরণ করা। এ লক্ষ্যে কাঙ্খিত উৎপাদন নিশ্চিত করার জন্য গরু,

ছাগল, মহিষ, ভেড়া, হাঁস, মুরগী, কোয়েল প্রভৃতি পাখির চিকিৎসা প্রদান, টীকা প্রদান, গবাদী পশুর জন্য কৃত্রিম প্রজনন সেরা শতভাগ নিশ্চিত করা।

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অধিদপ্তর

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার বিভাগে প্রধান ও মূল সমস্যা উপজেলার সকল অনুন্নত রাস্তা এবং বেরীবাধ নির্মান/সংস্কার করা। এ ছাড়া সেতু/কালভার্ট নির্মান, বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ এবং সংস্কার করা। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার নিজস্ব কার্যালয় নির্মাণ করা। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার বিভাগে জনবল বৃদ্ধি করা এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির বরাদ্দ প্রদান করা। সরকার তুলনামূলক সকল ক্ষেত্রেই বরাদ্দ প্রদান করে আসছে। উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা উপজেলা পরিষদের সদস্য হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছেন। উপজেলা পরিষদের প্রত্যাশা আগামী এক বছরের মধ্যে বর্ণিত চাহিদা মোতাবেক সেবার মান উন্নয়ন এর দৃশ্যমান পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হবে।

উপজেলা সমাজসেবা অধিদপ্তর

গজারিয়া উপজেলা সমাজসেবা দপ্তরের কার্যক্রমকে আরো বেগবান করে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির স্বনিভরতা অর্জনের প্রচেষ্ঠা গ্রহণ। সুদমুক্ত ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে পল্লীর জনগোষ্ঠির আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়ন। পরিসংখ্যান বিভাগের সহায়তায় ও উপজেলা পরিষদের অর্থায়নে এ উপজেলার বৃদ্ধি বিধবা, প্রতিবন্ধী ও অতিদরিদ্র জনসাধারণের জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর উপকারভোগীদের বাছাই এ আরো স্বচ্ছতা আনয়নের প্রচেষ্টা গ্রহণ।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

বর্তমানে উপজেলা শিক্ষা বিভাগের মূল ও প্রধান সমস্যা হলো অবকাঠামোগত সমস্যা। এছাড়া ছাত্র ছাত্রীদের জন্য রয়েছে অপ্রতুল আসন ব্যবস্থা ও সুপেয় পানির অপর্যাপ্ততা। তাই কোমলমতি শিশুদের শিক্ষার সুব্যবস্থা গ্রহণ করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। শিশুদের এ সাংবিধানিক অধিকারকে সুসংহত ভিত্তির উপর দাড় করানোর প্রচেষ্টা আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে। এ অবস্থা উন্নয়নের জন্য উপজেলা শিক্ষা অফিস, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহযোগিতায় উপজেলা পরিষদের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি দায়িত্ব পালন করবে। উপজেলা পরিষদের প্রত্যাশা আগামী এক বছরে এ উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষার দৃশ্যমান অগ্রগতি আরও উজ্জ্বল হবে।

উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া উন্নয়নের কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয়। এ লক্ষ্যকে সফল করার জন্য উপজেলা পরিষদ বদ্ধপরিকর। তবে নারীদের অংশগ্রহণের জন্য যে বাধাসমূহ রয়েছে তা সর্বাগ্রে দূর করার জন্য নানামূখী পদক্ষেপ ইতোমধ্যে স্থায়ী কমিটির সুপারিশে ভিত্তিতে এজন্ডাভূক্ত করা হয়েছে। যেমন- সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে নারীর ক্ষমতায়নে কিশোরীদের ক্ষমতায়ন, শতভাগ নারী শিক্ষা নিশ্চিত করা, যৌতুক, বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ করা, কঠোর হস্তে নারী নির্যাতন দমন, শিক্ষর্থীদের ইভটিজিংয়ের হাত থেকে রক্ষা করা। মাতৃত্বকালীন ভাতা ও প্রয়োজনে ভাতার হার বৃদ্ধি করা ও সর্বশেষ সচেতনতা ও আয়বর্ধক কর্মসূচী গ্রহণ করা।

উপজেলা প্রকৌশল অধিদপ্তর

তুলনামূলক বিচারে বিগত ৫ বছরে এই উপজেলার ভৌত অবকাঠামো এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যপক উন্নতি হয়েছে। অগ্রগতির এ ধারা অব্যাহত থাকলে উন্নয়নের প্রায় সকল বাধা দূর হবে। উপজেলা সকল ইউনিয়নের প্রধান প্রধান সড়ক পাকা করা হবে। জরাজীর্ণ আয়রন ব্রীজ প্রতিস্থাপন করে আরসিসি ব্রীজ নির্মাণ ও হাট বাজারের অবকাঠামো নির্মাণ করে ব্যবসা বানিজ্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে। দূর্যোগ মোকাবেলায় ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল ঝুঁকিপূর্ণ শ্রেণিকক্ষ অপসারণ করে আধুনিক ভবন নির্মাণ। উপজেলা পরিষদের উন্নয়ণ তহবিল ও এলজিইডির নিম্ন লিখিত উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে কাজগুলো বাস্তবায়িত হবে।

- পল্লী অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ কর্মসূচী।
- গ্রামীণ যোগযোগ উন্নয়ন প্রকল্প।
- জলবায়ূ সহনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।
- বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামো পূর্নবাসন প্রকল্প।
- অগ্রাধিকার ভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।
- ঘূর্ণিঝড় পুণরুদ্ধার কর্মসূচী (ECRRP)।
- সওজ হতে স্থানান্তরিত সড়ক নির্মাণ প্রকল্প।
- উপজেলা কমপ্লেক্সের সম্প্রসারণ প্রকল্প।
- প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী-৩।
- পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প।

উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

বর্তমানে গজারিয়া উপজেলায় স্যানিটেশন কভারেজ ৮৫% এবং নিরাপদ পানির ব্যবস্থা রয়েছে ৯৫%। আমাদের লক্ষ্য আগামী বছরের মধ্যে শতভাগ স্যানিটেশন এবং ১০০% নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা। আমাদের কাজের ধারা পরবর্তী বছরগুলোতে অব্যাহত থাকবে যাতে স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি আওতার বাহিরে কোন পরিবার না থাকে।

উপজেলা পল্লী উন্নয়ন বোর্ড

গজারিয়া উপজেলায় বিআরডিবির মূল প্রকল্প কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লী জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সংগঠন তৈরী, ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রশিক্ষন প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন এবং আইজিএ পরিচালনায় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত আছে। সুফল ভোগীদের সঞ্চয় জমার মাধ্যমে পুঁজি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঋণ বিতরণ ও আদায় প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। খেলাপী ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে বিভাগীয় নির্দেশনা প্রতিপালনপূর্বক কর্মৎত'পরতা বৃদ্ধির মাধ্যমে খেলাপী ঋণ আদায় বর্তমানে একটি সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। উচ্চ ফলন শীল ধান উৎপাদন, গবাদী পশুর রোগ-বালাই নিয়ন্ত্রনের জন্য উপজেলা পর্যায়ে কর্মকর্তা কর্তৃক সুফলভোগীদের প্রশিক্ষনের মাধ্যমে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিআরডিবি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। নিজস্ব বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় উৎপাদন দক্ষ জনবল সৃষ্টির ব্যবস্থা রয়েছে। আগামী ০১ (এক) বছরে বর্তমান কার্যক্রমের পরিসর আরো বৃদ্ধি পাবে এবং বিআরডিবি'র ভিশণ উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও টেকসই পল্লী উন্নয়ন সম্ভব হবে।

উপজেলা বন বিভাগ

জনগণকে বনায়ন কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করে এবং জনসচেতনতা সৃষ্টি করে এ উপজেলায় সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার পাশাপাশি হতদরিদ্র ভাগ্য উন্নয়নে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। জনসাধারন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নাম মাত্র মূল্য চারা বিতরণ করে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক বনায়নে আগ্রহী করা। গজারিয়া উপজেলার ১০টি ইউনিয়নের বিদ্যমান সংযোগ সড়ক এলজিইডি ও সড়ক ও জনপথের রাস্তা, বাঁধ এলাকায় জনগণকে সম্পৃক্ত করে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সামাজিক বনায়ন সৃষ্টি করা। এছাড়া চর এলাকায় উপজেলা পরিষদের সাথে অংশদারিত্বের ভিত্তিতে চর বনায়ন বাগান সৃজন ও সমৃদ্ধ করা।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

বর্তমানে গজারিয়া উপজেলাতে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ সর্বমোট ৭৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বিভিন্ন পাবলিক ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে দেখা যায় যে দারিদ্রতা, দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষকের অভাবে শিক্ষার গুনগত মানের দিক থেকে অত্র উপজেলা পিছিয়ে রয়েছে। আগামী ০১ (এক) বছরের মধ্যে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ তৈরী করে অত্র উপজেলার শিক্ষাকে একটি গুনগত পর্যায়ে পৌছানের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে উন্নয়নের দৃষ্টিতে রাখতে হবে।

১) শিক্ষার্থীদের জন্য ভৌত পরিবেশ তৈরী করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান উন্নীত করতে হবে।
২) ছাত্র/ছাত্রী ও শিক্ষকদের জন্য পৃথক শৌচাগার ও নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করতে হবে।
৩) মান সম্মত শ্রেণি কক্ষ তৈরী করতে হবে। বিশেষ করে যাতে মাল্টিমিডিয়া পরিচালনা করে পাঠদান করতে পারে তার জন্য সকল প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎতায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।
৪) প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য দক্ষ ও যোগ্য পরিচালনা পরিষদ গঠনের দিকে নজর দিতে হবে।
৫) দক্ষ ও যোগ্য বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক নিযোগ দিতে হবে।
৬) দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি বা আর্থিক সহযোগিতা ব্যবস্থা করতে হবে।
৭) বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ১০০% নিশ্চিত করতে হবে।
৮) ঝরে পরার হার ০% নামিয়ে আনতে হবে।
৯) জে, এস, সি ও জে, ডি,সি পরীক্ষায় পাশের হার ১০০% এর উন্নীত করতে হবে।
১০) মাধ্যমিক পর্যায়ে সকল প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান বিভাগ চালু হবে।
১১) মাধ্যমিক পর্যায়ে পাশের হার ১০০% এ উন্নীত করতে হবে।
১২) ২০১৮ সালের মধ্যে উপজেলাকে বাল্য বিবাহ মুক্ত করতে হবে।

উপজেলা পরিসখ্যান কর্মকর্তার কার্যালয়

ফসলের প্রকারভেদে আবাদী জমির ম্যাপ তৈরী করা হবে যাতে ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। প্রবাসীদের তথ্য সংগ্রহ করে ডাটাবেইজ তৈরী করা যাতে তাদেরকে সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে সহজে ওয়াকিবহল করা যায় ডাটা বেইজে উল্লেখিত প্রবাসীদের সাথে যোগাযোগ করে প্রবাসে যেতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগন তাদের পছন্দনীয় দেশে যেতে পারেন। সরকারী বেসরকারী স্ব-কর্মসংস্থান জরিপ করে কর্মক্ষম লোকের নির্ধারণ করা।

উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়

সরকারী হিসাব ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে সঠিক ও যুগোপযোগী হিসাবের কার্যক্রম সংকলন করা এবং উপজেলা পর্যায়ে চেক সিস্টেম চালু করনের অব্যাহত প্রচেষ্টা।

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচীর প্রকল্পসমূহের তালিকা (২০১৮-১৯)

ক্রমিক নং	প্রজেক্ট	উদ্দেশ্য	সম্ভাব্য ব্যয়
০১	ইসমানিরচর জেলেপাড়া হতে ইলিয়াছের বাড়ী পর্যন্ত গাইড ওয়াল নির্মাণ।	উপজেলার উন্নয়ন	৩,০০,০০০/-
০২	টেংগারচর পাকা রাস্তা হতে টেংগারচর বড় খাল পর্যন্ত রাস্তার পাশে ড্রেন নির্মাণ।	উপজেলার উন্নয়ন	৫,০০,০০০/-
০৩	পৈক্ষারপাড় তিন রাস্তার মোড়ে ২টি রিং কালভার্ট নির্মাণ।	উপজেলার উন্নয়ন	৮,০০,০০০/-
০৪	ভিটিকান্দি স্ট্যান্ড হতে নতুন রাস্তা হয়ে নদীর পাড় পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ।	উপজেলার উন্নয়ন	১০,০০,০০০/-
০৫	আলীপুরা হক সাহেবের বাড়ী হতে আলমবক্স মাষ্টারের বাড়ী পর্যন্ত ইউ ড্রেন নির্মাণ।	উপজেলার উন্নয়ন	১০,০০,০০০/-
০৬	আলীপুরা শিকদার বাড়ী ও প্রধান বাড়ীর মাঝে ব্রীজের গাইড ওয়াল নির্মাণ।	উপজেলার উন্নয়ন	৫,০০,০০০/-
০৭	কদমতলী হতে ভাষারচর পর্যন্ত রাস্তায় ইট সলিং করণ	উপজেলার উন্নয়ন	১০,০০,০০০/-
০৮	দড়িকান্দি ও কলসের কান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গাইড ওয়াল নির্মাণ।	উপজেলার উন্নয়ন	৪,০০,০০০/-
০৯	গোসাইরচর পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদের সামনে আর সিসি ঘাটলা নির্মাণ।	উপজেলার উন্নয়ন	৬,০০,০০০/-

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) কর্মসূচীর প্রকল্পসমূহের তালিকা (২০১৮-১৯)

ক্রমিক নং	প্রজেক্ট	উদ্দেশ্য	সম্ভাব্য ব্যয়
০১	হোসেন্দী মেইন রাস্তা হতে আশ্রাব্দী হাবিউল্লাহর বাড়ী পর্যন্ত নির্মাণ।	উপজেলার উন্নয়ন	৭,০০,০০০/-
০২	বালুয়াকান্দি মনিরের বাড়ী হতে কুতুবিয়া হোটেল পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	উপজেলার উন্নয়ন	৭,০০,০০০/-
০৩	মধ্য ভাটেরচর মেদাচ্ছেরের বাড়ী হইতে বিশদ্রোন ভাটেরচর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ্	উপজেলার উন্নয়ন	৪,০০,০০০/-
০৪	লক্ষীপুর পানির টাংকি হতে খালপাড় পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	উপজেলার উন্নয়ন	১২,০০,০০০/-
০৫	মধ্য বাউশিয়া নুরুল ইসলাম মাস্টারের বাড়ী হইতে পোড়াচক বাউশিয়া ঈদগাহ রাস্তা নির্মাণ।	উপজেলার উন্নয়ন	৫,০০,০০০/-
০৬	নতুন বসুরচর দোকান হতে নদীর পাড় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	উপজেলার উন্নয়ন	৫,০০,০০০/-
০৭	হোগলাকান্দি কবরস্থান হতে করিম খাঁ আল-আমিন হাজীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	উপজেলার উন্নয়ন	৫,০০,০০০/-
০৮	গজারিয়া মিয়াবাড়ী ব্রীজ হতে বাদল ঠাকুরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার।	উপজেলার উন্নয়ন	৫,০০,০০০/-

৮ম অধ্যায়

উপজেলা পরিষদ ও জেন্ডার উন্নয়ন

নারী উন্নয়ন ফোরাম

ভূমিকাঃ

স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন উপজেলা গর্ভন্যান্স প্রজেক্ট এবং ইউনিয়ন পরিষদ গভন্যান্স প্রজেক্ট এর আওতায় উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে নারী উন্নয়ন ফোরাম গঠন করা হয়েছে। ইউনিয়ন, পৌরসভা এবং উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত নারী জনপ্রতিনিধিগণ এ ফোরামের সদস্য হিসেবে তাদের এবং এলাকার নারী সমাজের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করবে। সাংগঠনিক নানাবিধ কাজের মধ্যে প্রতিটি নারী উন্নয়ন ফোরাম প্রতি দুই মাস অন্তর একটি দ্বি-মাসিক সভার আয়োজন করবে এবং ০৬ মাস পর পর অর্ধবার্ষিকী সভা আয়োজন করবে।

নারী উন্নয়ন ফোরামের লক্ষ্যঃ

ইউনিয়ন, পৌরসভা এবং উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত নারী সদস্যদের মাধ্যমে সমাজে নারীর ন্যায্য অধিকার, মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং নেতৃত্বের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিষদে তাদের ভূমিকা আরও জোরালো করা এবং নারী বিকাশের উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

নারী উন্নয়ন ফোরামের উদ্দেশ্য ঃ

- ইউনিয়ন, পৌরসভা এবং উপজেলা পরিষদে সামগ্রিক কার্যক্রমে নারী সদস্যদের ভূমি জোরদার করা।
- সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং জেন্ডার সংবেদনশীল করা।
- অন্যান্য নাগরিক সংগঠনের সাথে নেটওয়ার্কিং ও যোগাযোগ স্থাপন করা।
- পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রমে জেন্ডার সংবেদনশীলতা ও জেন্ডার সমতায় ভূমিকা রাখা।
- স্ব স্ব পরিষদ বা কাউন্সিলের কার্যক্রমে ভূমিকা রাখার জন্য স্থানীয় সরকার আইন-কানুন ও কার্যক্রম সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত হওয়া।

নারী উন্নয়ন ফোরামের কার্যক্রমসমূহ (গঠনতন্ত্র অনুযায়ী)ঃ

নারীদের নেতৃত্ব দেয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এমন একটি পরিবেশ তৈরী করা যার মাধ্যমে তারা এলাকার চাহিদার সাথে খাপখাইয়ে নিজেদের এবং এলাকার নারীদের জীবন অর্থবহ করে তুলতে পারে। নারী উন্নয়ন ফোরাম এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা করবে। নারী উন্নয়ন ফোরামের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ-

ক) উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহন বৃদ্ধিকরণঃ

- ফোরামের সদস্য এলাকার নারীদের ওয়ার্ড সভা, প্রচারণা মূলক কর্মসূচী ও বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে সচেতন করা।
- এলাকার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডে নিজেদের এবং অন্য নারীদের স্বেচ্ছাসেবক, উপদেষ্টা সেবাদানকারী এবং উপকারভোগী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করা।
- সরকারী-বেসরকারী সেবা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে নারীর অর্ন্তভূক্তি ও সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখা।
- নারী বান্ধব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে "নারী উন্নয়ন ফোরাম" এর সাথে উপজেলা, জেলা এবং এলাকার অন্যান্য নাগরিক সংগঠনের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং বিভিন্ন উন্নয়ন ইস্যুতে একসাথে কাজ করা।
- বিভিন্ন ধরনের তথ্য প্রাপ্তিতে এলাকার নারীদের সহায়তা করা।

খ) নারীদের দক্ষতা ও নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানোঃ

- ফোরাম সদস্য ও স্থানীয় নারীদের জন্য মৌখিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
- বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষনে অংশগ্রহণ এবং প্রশিক্ষনলব্দ জ্ঞান ও দক্ষতা যথাযথভাবে প্রয়োগ করা।
- পরিষদের বিভিন্ন কমিটি ও উন্নয়ন প্রকল্পের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের মাধ্যমে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানো।
- সামাজিক কর্মকান্ডে নিজেদের ও এলাকার নারীদের অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি করা।
- এলাকার নারীদের জন্য চাহিদা ভিত্তিক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।
- এলাকার নারীদের সংগঠিত করা এবং তাদের নেতৃত্ব উন্নয়নের সহায়তা করা।
- এলাকার বিভিন্ন সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হওয়া।

গ) নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ করাঃ

- ওয়ার্ড সভা, ইউজেডজিপি প্রকল্পের বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচী ও অন্যান্য সংগঠনের সাথে আয়োজিত সচেতনতামূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে জনসাধারণকে নির্যাতনের কুফল ও শাস্তি সম্পর্কে সচেতন করা।
- যৌতুক, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, তালাক ও ইভটিজিং প্রতিরোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, অন্যান্য সামাজিক সংগঠন ও নেটওয়ার্কের সাথে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করা।

ঘ) নারীর আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান সৃষ্টি করাঃ

- নারীর অধিকতর কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে সহায়তা করা।
- নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান।
- পেশাজীবি নারীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা প্রদান।
- স্থানীয় সামাজিক সম্পদ চিহ্নিতকরণ (পুকুর, জমি ইত্যাদি) ও ব্যবহারের পরিকল্পনা গ্রহণ করা।
- সরকারী ও বেসরকারী সেবা পেতে নারীদের অভিজ্ঞতা বাড়ানো।
- বেকার ও অসহায় নারীদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষতা ও আতম্কর্মস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- নারীদের আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ঋণ সহায়তার ব্যবস্থা করা।
- উৎপাদিত পন্য বাজারজাতকরনের ব্যবস্থা করা।

নির্বাহী কমিটির কার্যাবলীঃ

- নির্বাহী কমিটি সংগঠনের যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।
- বার্ষিক প্রতিবেদন ও বাজেট প্রণয়ন করবে এবং অনুমোদনের জন্য বার্ষিক সভায় পেশ করবে।
- বিভিন্ন প্রকার সভা (দ্বি-মাসিক, ষান্মাষিক ও বার্ষিক) আহবান করবে।
- সংগঠনের আয়-ব্যয় পরিচালনা করবে এবং হিসাব সংরক্ষণ করবে।
- নির্বাচন কমিশন গঠন ও নির্বাচন ব্যবস্থা করবে।

নির্বাহী কমিটির কর্মকর্তাদের ক্ষমতা ও কার্যাবলীঃ

(ক) সভাপতিঃ

তিনি সংগঠনের প্রধান হিসেবে বিবেচিত হবেন। সভা আহব্বানের জন্য তিনি সাধারণ সম্পাদককে অনুমতি প্রদান করবেন। তিনি সংগঠনের সকল সভায় সভাপতিত্ব ও সভা পরিচালনা করবেন এবং সভায় শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি যে কোন ব্যাপারে সমান সংখ্যক ভোট হলে অতিরিক্ত ভোট প্রদান করবেন।

(খ) সহ-সভাপতিঃ

সভাপতির অনুপস্থিতিতে তিনি ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন এবং তার সকল ক্ষমতার অধিকারী হবেন। সভাপতির উপস্থিতিতে তিনি তাকে পরমর্শ প্রদান করবেন এবং তার কাজে সহায়তা করবেন।

(গ) সাধারণ সম্পাদকঃ

তিনি সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি সভাপতির পরমর্শ মোতাবেক সভা আহবান করবেন। এছাড়া যাবতীয় সম্পত্তি ও খাতাপত্র রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি যে কোন খরচের জন্য ১,০০০/= (এক হাজার) টাকা পর্যন্ত অনুমোদন দিতে পারবেন। বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী তদারক করবেন এবং পরামর্শদান করবেন। তিনি সংগঠনের পক্ষে বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগ ও মামলা/মোকাদ্দমা সংক্রান্ত কাজ পরিচালনা করবেন।

(ঘ) নির্বাহী কমিটির সদস্যঃ

নির্বাহী কমিটির সদস্যগন সংগঠনের লক্ষ্যে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

নারী উন্নয়ন ফোরামের সভাসমূহঃ

সংগঠনের জন্য মোট ০৬ (ছয়) ধরনের সভার ব্যবস্থা থাকবে। যেমন (ক) বাৎসরিক সাধারণ সভা, গ) ষান্মাষিক সভা, গ) নির্বাহী কমিটির সভা, ঘ) উপদেষ্টা কমিটির সভা (যদি থাকে) ঙ) তলবী সভা ও চ) মূলতবী সভা। সংশ্লিষ্ট টিওআর টি নারী উন্নয়ন ফোরাম এর নির্বাহী কমিটির দ্বিমাসিক সভার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

নির্বাহী কমিটির দ্বিমাসিক সভার নিয়মঃ

এ সভা প্রতি ০২ (দুই) মাস অন্তর একবার অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাহী কমিটির সদস্যগন এ সভায় উপস্থিত থাকবেন। বিশেষ প্রয়োজনে বা মতামত প্রদানের জন্য উপদেষ্টা পরিষদ (যদি থাকে) এর কোন সদস্যকে এই সভায় উপস্থিত থাকার আহবান জানানো যাবে, তবে তাদের ভোটাধিকার থাকবে না। সভাপতির অনুমোদনক্রমে সাধারণ সম্পাদক এ সভা আহবান করবেন। সভার স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখ করে সভার বিজ্ঞপ্তি নোটিশ বইয়ের মাধ্যমে নির্বাহী কমিটির সদস্যদের নিকট অন্ত ০৫ (পাঁচ) দিন পূর্বে পৌছাতে হবে। ২/৩ ভাগ সদস্যের উপস্থিতিতে এ সভার ফোরাম পূর্ণ হবে। এছাড়া জরুরী কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনে সভাপতির অনুমোদনক্রমে সাধারণ সম্পাদক যে কোন সময় নির্বাহী কমিটির জরুরী সভা আহবান করতে পারবেন। জরুরী সভার ক্ষেত্রে নির্বাহী কমিটির সদস্যদের নিকট অন্তত ০৩ (তিন) দিন পূর্বে লিখিত নোটিশ পৌছাতে হবে। ২/৩ ভাগ সদস্যের উপস্থিতিতে এ সভার ফোরাম পূর্ণ হবে। উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা (M & E Plan):

উপজেলা পরিষদ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ (Monitoring) করবে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অগ্রগতি তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে উপজেলা চেয়ারম্যান প্রধান ভূমিকা পালন করবেন এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার এ বিষয়ে তাকে সহযোগিতা করবেন। প্রকল্পের প্রতিটি বাস্তবায়নকারী সংস্থা অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আরোহন বিষয়ক উপজেলা কমিটির নিকট ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন পেশ করবে। অগ্রগতি প্রতিবেদন সন্নিবেশিত করে পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত করার বিষয়ে অর্থ, বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আরোহন বিষয়ক উপজেলা কমিটিকে টিজিপি কমিটি সহযোগিতা করবে। উক্ত প্রতিবেদন উপজেলা পরিষদের নিয়মিত সভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে (অক্টোবর, জানুয়ারি ও এপ্রিল মাসে) পর্যালোচনার জন্য পেশ করতে হবে।

উপজেলা পরিষদের সভায় উপজেলা পরিষদ প্রকল্প / স্কিম পর্যালোচনা করবে। অভিষ্ট সূচক ও প্রত্যাশিত সময়সীমার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। পরিষদ পর্যবেক্ষনের ভিত্তিতে প্রয়োজন অনুসারে কোন প্রকল্প বাতিল করা অন্য প্রকল্পে সম্পদ স্থানান্তর করার (নতুন জরুরী প্রয়োজন, চাহিদা বা অগ্রাধিকার) সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সময় কাঠামো ও পর্যালোচনা চক্র

মাস	বছর (এন)	বছর (এন + ১)
মে	বার্ষিক বাজেট ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন	
জুন	বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন	
জুলাই	বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ	
আগষ্ট		বার্ষিক পরিকল্পনা ও সংশোধিত পরিকল্পনা থেকে উন্নয়ন চাহিদা ও অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা।
সেপ্টেম্বর		
অক্টোবর	১ম ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা	
নভেম্বর		
ডিসেম্বর		
জানুয়ারি	২য় ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা	
ফেব্রুয়ারি		
মার্চ		বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য প্রকল্প তালিকা প্রস্তুত করা ও উপজেলা পরিষদে প্রকল্প পেশ
এপ্রিল	৩য় ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা	নতুন প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ ও ব্যয় প্রক্কলন
মে		বার্ষিক বাজেট ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন
জুন		
জুলাই		বাস্তবায়ন ও তত্ত্বাবধান

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পর্যালোচনা ও সংশোধন বাজেটের সাথে সম্পর্কিত, কারণ বাজেটের মাধ্যমে বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। প্রতি বছরের এপ্রিল মাসের মধ্যে উপজেলা পরিষদের বাজেট প্রণয়নের পূর্বে বার্ষিক পরিকল্পনার পর্যালাচনা ও সংশোধন সম্পাদন করতে হবে। প্রয়োজন অনুসারে উক্ত অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের সাথে বার্ষিক পরিকল্পনা সংশোধন করা যেতে পারে। উক্ত সংশোধনী উপজেলা পরিষদের সভায় অনুমোদিত হতে হবে।

উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন কর্মকান্ডের আলোকচিত্র